চিদাকাশ

সুভাষ ঘোষাল

বরফ

রাতে বিছানায় নিজেকে সঁপে দেওয়ার আগে পঞ্জিকা দেখার অভ্যেস যাদের আছে সে তাদের দলে পড়েনা ঠিক। ওই সময়ে সে সাধারণত দেখতে চায় দূরদর্শন খুলে এক কেন্দ্র থেকে আর এক কেন্দ্রে চলে যাওয়ার সামর্থ্য।যে কাঁদছে তার ক ান্নাটা কৃত্রিম মনে হলে তাকে মুছে দিয়ে বহু দূরে যে হাসছে তার হাসির খুব কাছে চলে যাওয়া যায় মুহূর্তের মধ্যে। যদি মনে হয় হাসিটাও তার জাত খুইয়েছে তবে তাকেও মুছে দিয়ে এক লহমায় এমন শর্বরীরপ্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় যেখ ানে দেহের ভাঁজ যত খুলে যাচ্ছে ততই দানা বাঁধতে চাইছে দেহের কাজ নিঃশব্দে।আর দেহের সঙ্গে দেহের ঘর্ষণে যে অ াগুন জ্বলে ওঠে তাকে মুছে দেওয়া যায় না চট করে যতই বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষমতা থাকুক হাতের মধ্যে। এইসব অনাসক্তি আর আসক্তির মধ্য থেকেই সুযোগ খুঁজে নিয়ে সে যে কখন ঘুমিয়েপড়েতা সে নিজেও টের পায় না সবসময়। কিন্তু কাল র াতে নিজেকে বিছানায় সঁপে দেওয়ার আগে তার মনে হয়েছিল, এই শতাব্দীর কোনো এক বছরের প্রতিনিধিত্ব করছে যে মোটা বইটি, যার সাহায্য নিতে এগিয়ে এসেছে কেন্দ্রীয় সরকারও, তাকে এতখানি অবহেলা করার মধ্যে এমন কোনো গৌরব লুকিয়ে নেই। বইটি কেনার পর থেকেই একেবারে চোখের সামনে, হাতের নাগালের মধ্যে অবস্থান করলেও তাকে তেমন করে স্পর্শ করা হয়নি কখনো। যেবইয়ের মধ্যে তিথির মানচিত্র আছে, স্নানযাত্রার ক্ষণ আছে, উৎসবের বোধনক্রিয়া বলে দেওয়া আছে ধাপে ধাপে,তাকেআর কতকাল দূরে সরিয়ে রাখা যায় কাছে রাখার দৌলতে ? এই প্রশ্ন ঘনীভূত হলে নচিকেতা কাল বেশ রাতে কোলের মধ্যে টেনে নেয় পঞ্জিকা। আর তার মনে হতে থাকে বঙ্গাব্দের শামিয়ানার তলায় বসে পড়া সম্ভব হয়েছে অবশেষে। হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়, দিনের পর দিনের যে মেলা তার ভিড়ে বাঁশি কিনতে গিয়ে পথ হ ারানোর ভয়ে সাধারণত সে নিজেকে কেবলমাত্র বর্তমানের দিকে নিয়ে যায় শেষে। গতরাতে খাটে পা ঝুলিয়ে বসে সে কিন্তু ভবিষ্যতের দিনটার দিকে তাকিয়েছিল। তার চোখে পড়েছিল একটা আয়তক্ষেত্র। তার মধ্যেই লেখা আছে এক মাস ধরে আকাশে আঙিনায় যে দীপদান তার এইদিন থেকেই সূচনা হচ্ছে। এমনকী দীপদানের মন্ত্রও লেখা হয়েছে পরিষ্কার করে। দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ। /প্রদীপন্তে প্রযচ্ছামি ন মোহনন্তায় বেধসে।। পরিষ্কার করে এর অর্থটাও লেখা থাকলে খুব খুশি হতো নচিকেতা।

সংস্কৃতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সেই কবে শেষ হয়ে গেছে। ভাষাটা স্কুলে যাঁরা শেখাতেন তাঁরা কেউই আরবেঁচে নেই। এমন কথাও বলা যাবে না যে তাঁরা গত হয়েছেন সম্প্রতি। সংস্কৃত পড়ার সূত্রে সে সাকুল্যে তিনজন শিক্ষকের সংস্পর্শে আসে। একজন বেত হাতে করে পড়াতে আসতেন। শব্দরূপ আর ধাতুরূপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেপারলেই তিনি উৎফুল্ল হতেন যারপরনাই। মুখের চর্বির মধ্যে হাসি বুদ্বুদসম প্রকাশিত হয়ে হারিয়ে গেলেও তার একটা প্রভাব ছিল অন্যরকম। টেবিলে বেত্রাঘাত করে তিনি বুঝিয়ে দিতেন মুখস্থ করার প্রমাণ এত ভালোভাবে দিতেপারার ফলে তাঁর ফুল্লতার পরিমাণ কতখানি হয়েছে। তিনি কতখানি বিরক্ত হয়েছেন তা বোঝানোর জন্য যার শব্দরূপ বা ধাতুরূপ মুখস্থ হয়নি তার গালে বেতের অগ্রভাগ ঠেকিয়ে মুখমণ্ডলের চর্বির অসহযোগিতা সত্ত্বেও হেসে নিতে চাইতেন যতটা সম্ভব। মূষিক সামনে রেখে ম ার্জারের ভূমিকায় নেমে তিনি এমনভাবে খেলা করতেন যার মধ্যে হিংসার পরিণাম নেই, আছে কেবল ছায়া। সেই ছায়াই

যথেষ্ট ছিল যার পড়া হয়নি তাকে পড়ুয়া করে তোলার পক্ষে। ভয় দেখিয়ে জয় করার এই ধারাটা খুবই নিজস্ব হয়ে ওঠে তাঁর। মাঝে মাঝে নচিকেতার মনে হয়েছে বেত্রাঘাত না পেয়ে এই যে প্রতি মুহূর্তে বেত্রাঘাত পাওয়ার আশঙ্কা এটাই অ াসলে আরো প্রবল শাস্তি। একদিন ক্লাসে বেত হাতেঢুকে টেবিলে বেত রেখে তিনি নচিকেতার নাম ধরে ডেকেছিলেন। সে সেদিন প্রথম সারিতে বসেও শেষ সারিতেবসার অপরাধ ও অস্বস্তি নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় এবং অপেক্ষা করতে থ াকে গালের ওপর এসে পড়া বেতের। সেদিন শিক্ষক তাঁর প্রতিত্রিয়া প্রকাশ করতে একটু যেন বেশি সময় নিচ্ছিলেন। চর্বির অসহযোগিতা সত্ত্বেও হেসেনিতে চাইবার যে অধিকার তার থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে নিয়ে তিনি নীরবতাকে আসন করে দিয়েছিলেন। পরে তাঁর শব্দগুলি এসে সেই আসনের ওপরেই ঝরে পড়ে। ---তুমি নচিকেতা? কিন্তু তোমার চোখে সেই জিজ্ঞাসা কই ? তিনরাত্রি নচিকেতা যমের গৃহে অনাহারে বাস করেন। তাই যম প্রতি রাত্রির জন্য একটি করে মোট তিনটি বর তাকে দিতে চেয়েছিলেন। তৃতীয় বর প্রার্থনা করে যমকে খুব অস্বস্তিতে ফেলে দেন তিনি। তিনি আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ববিষয়ে জানতে চাইলে তাঁকে জিজ্ঞাসা থেকে চ্যুত করার জন্য অনেক প্রলোভন দেখিয়েছিলেন যমরাজ। কোনো ক ায়দাই যখন কাজে লাগে না তখন যমরাজ কী বলেছিলেন জানিস? বলেছিলেন ---তোমাদের মতো জিজ্ঞাসুরাই যেন অ ামাদের কাছে আসে। তোর চোখে সেই জিজ্ঞাসা কই রে? তবে তোর কলম কিন্তু খুব ভালো চলেছে। আত্মবিদ্যা না থ াকলেও মুখস্থবিদ্যেটা বেশ রপ্ত করেছিস। তোকে আমি একশোর মধ্যে নববই দিতে বাধ্য হয়েছি। এবার কিন্তু চর্বির অসহযোগিতা সত্ত্বেও হাসি এল। একটা চাপা অথচ কুলকুল ধারায় তা ছড়িয়ে পড়ল তাঁর শরীরের মধদেশেও।পরবর্তীক ালে এই শিক্ষকের খোঁজ নিতে গিয়ে সে জানতে পেরেছিল যে তাঁর মৃত্যু রোগ শোক বা বার্ধক্যে হয়নি। চরম কথাকাটাকা টি তথা উত্তেজনার মূহূর্তে তাঁর একতলার ভাড়াটেরা তাঁর মাথা দুভাগ করে দেয়। হাসপাতালে চবিবশ ঘন্টা কাটানোর আগেই তিনি মৃত্যুলোকে প্রবেশ করেন। সারাক্ষণ অচৈতন্য থাকায় তাঁকে পেতে হয়নি মৃত্যুভয়।

দ্বিতীয় শিক্ষকের হাতে বেত থাকত না কোনোদিনও। হাতই ছিল তাঁর প্রধান অস্ত্র। যখনতখন কারনে - অকারণে ছাত্রদের কানে বা শ্রোণিদেশে তাঁর হাতের সত্রিয়তা ছিল প্রচুর পরিমাণে। কাকে কানমলা বলে কাকে বলে চিমটি কাটা তা হাড়ে হ াড়ে টের পেলেও নচিকেতা টের পেত একইসঙ্গে যে, তাঁর দারিদ্র্যের আকুতির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে সমানে। বেশ কয়েকটি সন্তানের পিতা হওয়ার সুবাদে স্কুলের বাইরে তাঁকে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হতো গৃহস্থবাড়ির পৌরোহিত্যকর্মে। পৌরো হিত্যের চাপ বেড়ে গেলে শিক্ষকতার চাপ থেকে তিনি ছুটিও নিতেন মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে। ফলে বিদ্যালয়ে তাঁর আসন রক্ষার জন্য তিনি কতৃপক্ষের কাছে যত বিনয় যত আনুগত্য প্রকাশ করতেন ঠিক ততটাই বিরক্তি আর বিত্রম প্রকাশ পেত ছ াত্রদের কর্ণ আর শ্রোণিদেশে তাঁর হস্তের যথাযথ প্রয়োগের ব্যাপারে।বিশেষ করে জুতসই চিমটি কাটার জন্য তিনি ঘরে একদিক থেকে আর একদিকে যেতে পারতেন অনায়াসে। যে সবক্ষেত্রে তাঁর হাত ফসকে যেত সে সব ক্ষেত্রে শিকারের সমীপবর্তী হয়ে তিনি সেই ব্যর্থতা উশুল করে নিতে চাইতেন মুখ বিকৃত করে। কিন্তু তাতে তাঁর দারিদ্র্যের আকৃতি কোনে াভাবেই লুপ্ত হতো না। একবার নচিকেতা তার মায়েরসূত্রে তার মাস্টারমশাইকে বাড়িতে নিয়ে আসে। মা তাঁর কোনো একটি ব্রতসমাপনের জন্য ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন করেন। খাওয়াদাওয়ার পর দক্ষিণা হাতে নিতে তিনি নচিকেতার হ াত ধরে বাসরাস্তার দিকে যেতে যেতে কেমনযেন আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। সেই অবস্থায় তিনি বলে ওঠেন --- বাবা, শব্দরূপ ধাতুরূপ নয়। অনেক হয়েছে। শব্দ নিয়ে, ধাতু নিয়ে ভালো করে পড়াশোনা করো। না হলে শেষে আমার অবস্থা হবে।

সংস্কৃতের আর একজন শিক্ষক সবসময় এত সপ্রতিভ থাকতেন যে তাঁকে সহজেই ইংরেজির শিক্ষক বলে গণ্য করার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হতো। সেই পরিস্থিতিতে তিনি কিন্তু কখনোই পিছিয়ে আসতেন না। ছাত্রদের মুখোমুখি হতেন মেদণ্ড সে াজা রেখে। ---তোমরা সব কাগজকলম নিয়ে বসে পড়ো। আমি একটা বই থেকে পড়ে যাচ্ছি। তোমরা শুনতে শুনতে লিখে নেবে। যত লিখবে তত মনে বসে যাবে ব্যাপারটা। লেখা শেষ হলে ওই অংশটুকুর ইংরেজি অনুবাদ করতে আর কে ানো কষ্ট হবে না। তিনি যে বই থেকে পড়তে শু করলেন সে বই বেরোনোর পর লেখককে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে এসেছিলেন তখনকার প্রকৃত গুণীরা। বইটির মধ্যে কাহিনীর অংশ কম, চিন্তার অংশ অনেক বেশি। মানুষ প্রকৃতির মধ্যে যত নিজেকে মেলে ধরেছে তত প্রকৃতিও চাইছে মানবিক হয়ে উঠতে দিনেরাত্রে। শিক্ষক অনুবাদের জন্য যে অংশটি বেছেছিলেন তার মধ্যে এমন একটা মুখমণ্ডলের সৃষ্টি করেছিল যার অনুসৃষ্টির কথা ভাবতে গেলে রীতিমতো ভয় হয়

নচিকেতার আজও। সংস্কৃতের শিক্ষক অভয় দিয়েছিলেন ইংরেজিতে। ডু ইট। ডু ইট নাউ। মাতৃভাষা থেকে পরভাষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সেই নীরব চেষ্টা যে খুব বেশি গৌরবের বাহন হতে পারেনি তা বলা বাহুল্য। কিন্তু তিনি অন্তত একজন ছাত্রের মধ্যে প্রবাহিত করতে পেরেছিলেন সেই আবেগ যা পরিণামের কথা না ভেবে পরিণত হয়ে ওঠার বাসনার কথা ভাবে আপনমনে। বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসার অনেক পরে এই শিক্ষক তাদের পাড়ায় উঠে আসেন। কোনো এক দোতলার কোনো এক সংসারের কোনো এক ঘরে তাঁকে থাকতে দেওয়া হয় অনতিতুচ্ছ ভাড়ার বিনিময়ে। অন্যের সংসারের মধ্যে তার বাসস্থল ছিল বলে দূর থেকে তাঁকেমনে হতো সেই সংসারেরই একজন। তিনি যখন সকালের রোদে সে বাড়িওয়ালার কনিষ্ঠ সন্তানকে আদর করতেনতখন তাঁকেই মনে হতো দায়িত্বপ্রাপ্ত গৃহস্বামী। অন্যের ঘরের মধ্যে দিয়ে তাঁর ঘরে যেতে হতো বলে নচিকেতা তাঁরকাছে যাওয়ার ইচ্ছেটাকে সামলে নিত যখনতখন। বরং যখনতখন একসময়ের ছাত্রের কাছে আসতেন তিনি স্বয়ং। ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়ানোর ফাঁকে তিনি প্রাক্তন ছাত্রের কাছে ছুটে এসে বুঝে নিতে চাইছেন কোনো ফরাসি কবিতার শেষ স্তবকের উল্লম্ফন। কিংবা জানাতেন, ভূমধ্যসাগরের তীরে রচিত কোনো উপন্যাসের দর্শনের ক্ষেত্রে পুরাণের সেই অংশটুকু কতটা সহায়ক বলে মনে হয় তাঁর কাছে, যেখানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পাথর ঠেলে ঠেলে ওপরে নিয়ে যাওয়ার পর সে পাথর নীচে গড়িয়ে পড়তে থাকলে তাকে আবার তুলে ধরার চেষ্টা নিম্নগামিতার দ্বারা নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে বারংবার। তাঁর এস্রাজ ছিল। আর ছাদে ছিল ছোটো একটি আয়তন যেখানে স্টোভ জ্বালিয়ে তাঁকে রান্না করার সুযোগ করে দেওয়া হয়। ঘরের মধ্য দিয়ে ঘরে যাওয়ার অস্বস্তি বিজন সোপানগুচ্ছ পেরিয়ে ছাদে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে অবলুপ্ত হতো বলে মাঝে মাঝে নচিকেতা ছাদে যেতে পেরেছে। উচচতায় রান্নার সেই সুযোগের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করতেন শিক্ষক। অগ্নিকে তার কাজ করতে দিয়ে তিনি ছাদের মেঝেতে ধুতি তুলে বসে পড়ে ছড় টানতেন। সুর ছড়িয়ে পড়ত ছাদে। সেই সুরের মধ্যে বসে পড়ে নচিকেতা পঁচিশে বৈশাখ আর বাইশে শ্রাবণের মাঝখানের সেই নিরবচ্ছিন্ন আকুতি ধরতে চাইত যার সত্যিই কোনো অনুবাদ হয় না।

তাঁর কোনো সংসারের মধ্যে লুকিয়ে থাকার পর্ব খুব বড়ো ছিল না। ঘর ছেড়ে দেওয়ার চাপ আসতে থাকেক্রমাগত। সেই চাপের কাছে নতি স্বীকার করে তিনি দেশের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সংকল্প করেন। সেই সংকল্প থেকে তাঁকে নিরস্ত করার সাধ্য ছিল না নচিকেতার। যেখানে তাঁর অন্ন রান্না হতো ছাদের সেই ফুটকির সামনে তাকে তিনি একদিন ডেকে পাঠান। বিজন সোপানগুচ্ছ পেরিয়ে সে তাঁর মুখোমুখি হয়ে দেখতে পায় তিনি কোলে এস্রাজ রেখে যে অগ্নি কর্মযোগী তার বর্ণের দিকে তাকিয়ে আছেন। --- তুমি এসে গেছ ! আমি তোমার অপেক্ষাই করছিলাম। বসো, ভালো করে বসো। নচিকেতা রাত্রির খোলা আকাশের নীচে আসন করে বসতে না বসতেই যে সুরটি আতিথেয়তা করার জন্য প্রস্তুত হলো তা এক বাউলের কাছ থেকে আর এক বাউলের কাছে গিয়ে নতুন এক সঙ্গীতের দীপ্তির জনক হয় এবং সেই সঙ্গীত শেষে হয়ে ওঠে একটি সদ্যোমুক্ত ভূখণ্ডের জাতীয়সঙ্গীত সমস্বরে। সুরের পুরোটাইবইয়ে দিয়ে তিনি শুধু একবার উঠে গিয়ে দেখে আসেন ভাত কতটা সেদ্ধ হলো। ফিরে এসে নির্দেশ দেন --- কই হাত পাত। তোমার হাতে চলে যাওয়ার আগে আমি এই এস্রাজ দিয়ে যেতে চাই। সম্ভব হলে বাজনাটা শিখে নিয়ো। নাও যদি শেখ রেখে দিয়ো তোমার কাছে। সেদিন নচিকেতা খুব আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল সেই বাজনা। তিনজন শিক্ষকই অনেক আগেই বিলীন হয়ে গেছেন ভিন্ন ভিন্ন দিকে। কিন্তু এস্রাজটিকে এই সেদিন পর্যন্ত সে বিলীন হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল। যদিও সেই চেষ্টার মধ্যে তেমন উদ্যম ছিল না।

সৃষ্টির আদিকালে তাদের একান্নবর্তী পরিবারের রান্না যে ঘরটিতে হতো ঘরটিতে যেতে হলে শোওয়ার ঘর থেকে বারান্দায় এসে খানিকটা অবতরণ করে তারপর এগিয়ে যেতে হতো খানিকটা। অর্থাৎ রান্নাঘরে যাওয়ার আগে মন গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ যেমন ছিল তেমন করেই ছিল রান্নাঘরকে পরিমণ্ডল থেকে শেষে নির্লিপ্ত করে নেওয়ার ব্রতাবকাশ। নচিকেতা বাল্যাবস্থায় শেষ রাতে জেগে উঠে স্নান করে অগ্নির সান্নিধ্যে পৌঁছে যাওয়া মাকে বেলায়স্পর্শ করতে গিয়ে টের পেয়েছে একটা অন্য রূপে ত্বক। কালক্রমে যারা শোওয়ার ঘরের পাশেই রান্নাঘরকে পেতে চেয়েছে, যারা চায়নি এমন কোনো দ্বীপ যেখানে মন বেঁধে যেতে হয়, তাদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে বেশ একটি গুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করলে মায়ের রান্নাঘর পরিণত হয় একটা ক্ষেত্রে। এমন ক্ষেত্র যেখানে এমন সব দ্রব্য রেখে যাওয়া যায় যেগুলির জন্য চট করে জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ ঘর থেকে ঘরে উপছে পড়ছে প্রয়োজনের জিনিসপত্র। যে সব জিনিসের সঙ্গে প্রাত্যহিকতার প্রত্যক্ষ

সম্পর্ক নেই, যে সব জিনিসের মধ্যে দ্রব্যগুণ কোনোভাবেথাকলেও নেই প্রতিনিয়ত মথিত হওয়ার সামর্থ্য, তাদের জন্য ওই ক্ষেত্রের মধ্যে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তোলা হয় উন্মুখতা। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নচিকেতা সেই এস্রাজ এনে রাখে সেই ক্ষেত্রে। ফেলে রাখতে চায়নি, সাজিয়ে রাখতে চেয়েছে এক কোণে এই আশা নিয়ে যে, একদিন কেউ এসে ওই যন্ত্রের ম াধ্যমে ঠিক চিনিয়ে দিতে পারবে যে -এবার মাতৃমুখী এবং অগ্নিশুদ্ধ ছিল তার যথার্থ রাগিনী। সকলের অজান্তে সেই ক্ষেত্র একদিন পরিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।ফল পরিপূর্ণ হলে দেহ পরিপূর্ণ হলে যেভাবে পতনের সূচনা হয় ঠিক সেইভাবেই সেই ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করে লয়ের বীজ। একদিন নচিকেতা নিজের খেয়ালে কোথাও না গিয়ে তাদের বারান্দায় এসে দাঁড়ায় এমন এক সময়ে যখন দুপুর স্তব্ধতাকে করে তুলেছে পরাক্রমশালী এবং অনন্য। তার মনে হয় এই সেই মুহূর্ত যখন অবতরণের প্রয়োজন আছে। ফলে সে অবতরণ করে এবং এগিয়ে যায় খানিকটা। সে আবিষ্কার করে যে ক্ষেত্রে এসে গেছে কালচিহ্।একদিন যে সুরযন্ত্র সে ঊর্ধ্বে উঠে গ্রহণ করেছিল তার মধ্যেও এসে গেছে আয়ুর আলো থেকে সরে আসার পরিণাম। তাকে কোলের কাছে আনতে গিয়ে হারিয়ে ফেলে তার দ্রব্যগুণ কখন যেন।

এক মাস ধরে আকাশেব আঙিনায় ভবিষ্যতে যে দীপদানক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে আলাদা ঘর কেটে, তার মন্ত্রের অর্থোদ্ধ ার করার মতো মানুষ নচিকেতার হাতের কাছে আর একজনও নেই এখন। কিন্তু সকালের প্রকাশ দেখলে মনে হয় এমন কে ানো মানুষ খুব কাছেই অপ্রকাশিত অবস্থায় আছেন যাঁর হাতে এই মন্ত্র তুলে দিলে জ্বলে উঠবে তাঁর হাসির দীপ। কদিন ধরে এত গরম পড়েছিল যে মনে হচ্ছিল সহ্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়াতে হয়েছে। এর পরে গরম আরো বাড়লে শুধু দেহ নয় মনও বিদগ্ধ হবে বলে পর্জন্যের জন্য প্রার্থনা ছিল সর্বাত্মক। শেষ রাতেরদিকে কিন্তু বৃষ্টি হলো দেড় ঘন্টা ধরে অবির াম। সকালবেলায় রোদ ওঠেনি। মেঘের একটা হালকা উপস্থিতি মৃদুমন্দ বাতাসের সহযোগিতায় একটা আশা জাগিয়ে তুলতে চাইছে কোথাও। নাচিকেতা সেটা টের পায় এবং ঘর ছেড়ে পথে নামতে তার দেরি হয় না খুব একটা।

সে এখন দক্ষিণদিকে যাবে। দক্ষিণদিকে একটা অংশ ভারী বৃষ্টিপাতে জলমগ্ন হয়। গোড়ালি থেকে ওপরদিকে পাকে অন াবৃত করতে করতে সাবধানে যারা এগিয়ে যায় তাদের দলে যোগ দিয়েও সে খুব বিজন এবং বিপন্ন বোধ করে বরাবরই। তার মনে হয় সামনের কোনো বিবর তারই অপেক্ষায় মুখ খুলে রেখেছে। সে যদি একবার সেখানে গিয়ে পড়ে তবে কী যে হবে তা ভাবতেও তার মাথা ঘুরে যায় নির্ঘাত। ফলে তার পক্ষে পা টিপে টিপে অগ্রসরহওয়ার কাজটা যত কঠিন হয় ততই সে দ্রের দক্ষিণমুখ ভেবে দেখার চেষ্টা করে। আজও এ ভাবেই সে দক্ষিণের জলমগ্ন অংশ পার হয়ে নিরাপদ ক্ষেত্রে পৌঁছে ঠিক করে নেয় পরনের বস্ত্র। চটি যেমন ভিজে ন্যাতা হয়ে গেছে তেমন দুটি পায়েই ফুটে উঠেছে ধৌত হয়ে ওঠার স ারল্য। এই সরল পদযুগল নিয়ে সে হাঁটতে থাকে। বোধহয় বুঝতেও পারে যে, পথের শেষে পৌঁছোতে গেলে জলমগ্ন পথেরও প্রয়োজন আছে নিঃসন্দেহে।

সুশীলদের প্রধান দরজা লৌহনির্মিত। দরজার সামনেই যে কল সেখান থেকে জল পড়ছে মোটা ধারায়। নচিকেতা ভেতরে প্রবেশ করে কলক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যায়। সুশীলদের বাইরের মহল এবং ভেতরের মহলের ঠিকমাঝখান দিয়ে সোজা একটা পথ চলে গেছে বাড়ির ঠিক পেছনদিকে নির্বিবাদে। পেছনদিকে এখনো একটা মাঠের মতো খোলা জায়গা আছে। ত ার একদিকে রেললাইন এবং আর একদিকে টিনের চালের ঘর বেশ কয়েকটা। ওপরেবিরাজ করছে কেবল টালি এমন ঘরও সংখ্যায় খুব কম নেই কিন্তু। যদি আইনের প্রশ্ন ওঠে তবে টিন বা টালি যা দিয়েই ঘরের ছাদ হোক না কেন, খোলা জ ায়গা যতই মাঠের সাদৃশ্য লাভ কক না কেন সবকিছুই কিন্তু সুশীলদের অধিকারে আজও। যদি দাপটের প্রশ্ন ওঠে তবে বলে রাখা ভালো পেছনের দিকটা প্রায় স্বয়ংশাসিত অঞ্চল হয়ে উঠেছে। সুশীল বা তার ভাই মালিকানার জোরে সেখানে গিয়ে দাঁড়ানোর কথা ভাবতে পারে না কখনো। বরং সংগঠিতহওয়ার জোরে যারা পেছনে থাকে তারাই সুশীলদের স ামনে এসে দাঁড়ায় বা দাঁড়াতে পারে যখনতখন। লৌহনির্মিতসদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে গেলে সামনে - পেছনের অ াসাযাওয়ার এই হিসেবটা ভুলে গেলে চলবে না কিন্তু। বাইরের মহলের সব ঘরেই বছরের অধিকাংশ সময়ে তালা ঝে ালে। সেইসব ঘরে দিনযাপন করার মানুষ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। শুধু ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন একটি ঘরে একজনই। তঁ ার পিতৃদত্ত নাম আনন্দ। নচিকেতার আনন্দদা। বছরের পর বছর ধরে রোজ সকালে ঘন্টাখানেকের জন্য আনন্দদার ঘরে এসে পড়ে নচিকেতা। হ্যাঁ, বছরের পর বছর।

নচিকেতা প্রবেশ করার পরে সাধারণত সোজা আনন্দদার ঘরে চলে যায় অন্য কোনোদিকে তেমন করে নাতাকিয়ে।

সর্বদিকে বিশেষভাবে তাকানোর জন্য সে সাধারণত বেছে নেয় সেই সময় যখন সে চুপ করে আনন্দদার খাটের ওপর বসে তাঁর গোটানো শয্যার পুঞ্জীভূত অবস্থানে হেলান দিয়ে তাঁর ঘরের অবারিত দরজার দ্বারা দেখে ফেলার সুযোগ পায় স ামনের পরে থাকা আয়তন। আজ সে আনন্দদার ঘরে না গিয়ে ডানদিকে পাঁচিলের কাছে চলে যায়। পাঁচিলের কাছে কলক্ষেত্রের বালতির পর বালতি সাজানো থাকে। যাদের যাদের বালতি তারা প্রত্যেকেই পৃথকভাবে উপস্থিত থাকে না সবসময়। যারা উপস্থিত থাকে তারা অনেকসময় দায়িত্ব নেয় যারা অনুপস্থিত তাদের জলাধারের। কখন কোন পূর্ণগর্ভ অ াধার সরিয়ে কোন শূন্যগর্ভ আধারকে যথাস্থানে স্থাপিত করতে হবে তা যারা জানে তাদের কেউ উপস্থিত থাকলেই কাজ চলে যায় বলে সবসময় কলতলায় থকে না অপেক্ষার ভিড়। আজ এমন একটি মেয়ে একাই সামলাচ্ছে গুদায়িত্ব যে যৌবনে পৌঁছেও ফ্রক ছাড়েনি এবং শীর্ণ হয়ে আছে আপাদমস্তক। ঊর্ধবভাগ কিংবা সানুদেশে এমন কোনো উদয়ন নেই যা সাহায্য করে প্রবৃত্তিকে। তবু সে বলীয়ান জলধারাকে দাপটের সঙ্গেআয়ত্তে রাখছে কেউ এসে পড়ার আগে। তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল নচিকেতা। ---আমি একটু পাটা ধুয়ে নেব ? যে প্রশ্ন গ্রহণ করে তাকে পেছন ফিরে তাকাতে হয় এবং দেখতেও হয় তাকে যে বছরের পর বছর ধরে আনন্দদার চৌকিতে বসে তাদের বাল্যকাল থেকে দেখে আসছে। মেয়েটি কলমুখ থেকে জলধারা সরিয়ে নিজেও একপাশে সরে দাঁড়ায়। ---নিন, ধুয়ে নিন। নচিকতা এগিয়ে এসে তার পা এগিয়ে দেয় জলের তলায়। আকাশের জল পৃথিবীতে পড়েযথেষ্ট মলিন হয়ে ওঠে বলেই তো ধৌত পদযুগলকে বিধৌত করে নিতে হয় আনন্দদার ঘরে সরাসরি না গিয়েআজ। এই সুযোগে সে দেখেও নিতে পারে তার পায়ের রং তথা শিরা একে অপরের সঙ্গে কীভাবে জড়িয়ে থেকে ফুটিয়ে তুলছে পদমর্যাদা। তাদের ভেতরের ঘরের দেয়ালে তার ঠাকুমার পদচিহ্ এক দেয়ালে ঠাকুমার আর এক দেয়ালে তার মায়ের। ঠাকুমার চলে যাওয়ার কুড়ি বছর বাদে মায়ের চলে যাওয়া। তারপরেও আরো প্রায় কুড়ি বছর কেটেগেছে। নচিকেতা জানে না চলতে চলতে সে কখন ঝরে পড়বে। যদি ঝরে পড়ার ব্যাপারটা খুবই অ াসন্ন হয়তবে কি ভেতরের ঘরের আরো এক দেয়ালে ঝুলবে তারই পায়ের ছাপ ? এই প্রশ্নের কুঁড়ি ফুটে ওঠার আগেই সে কুড়ি বছরেরহিসেবের খেলা থেকে সরে আসে হঠাৎ। কারণ বালতির পর বালতি জমে আছে। অপেক্ষারত আধারের পর আধার। এমনকি নিষ্ফল যৌবনও উন্মুখ। ফলে তাকে সরে আসতে হয়।

আন্দদার দরজাই শুধু উন্মুক্ত নয়, তিনটি জানালও খোলা আছে ষোলোআনা। খাটের এক কোনে গোটানো বিছানা থ াকলেও ঘরে তিনি নেই। ছোটো ছোটো হাওয়া এসে বরণ করে নিতে চাইল নচিকেতাকে। তাঁর খোলা ঘরে বসে তাঁর জন্য খোলা মনে অপেক্ষা করার ঘটনা তো এই প্রথম নয়। দরজা তথা জানলাগুলি খুলে থাকা মানেতিনি খুব কাছেই কে াথাও গেছেন। হয়তো সামনের কোনো মুদিখানার দোকানে একশো টাকার নোট ভাঙাতে কিংবা গায়ে মাখার ঝাঁজালো সর্ষের তেল কিনতে। হ্যাঁ, শীতকালে শুধু নয় সব ঋতুতেই তিনি গামছা পরে তেল মাখেন নিবিড়ভাবে। তাঁর মাথার চুলের মধ্যে যে তেল গিয়ে বসে যায় সেটাও কিন্তু সেই সর্ষেরই। নচিকেতা মাথায় নয় গায়ে শীতের কয়েকটা দিন সর্ষের তেল ম াখে। এই তেলও কিন্তু স্বহস্তে কিনে এনে তার হাতে উপহাররূপে প্রতিবছর তুলে দেন আনন্দদা। দুবোতল তেলে তার অনেকদিন চলে যায়। শুধু সে গায়েতেই মাখে না, মুড়িতেও মাখে। ঘি দিয়ে নয়, মাখন দিয়েও নয়, গরম ভাত আর ড ালের সঙ্গে আলুভাতে খাওয়ার সুযোগ এলে এই তেল দিয়েই সে মেখে নেয় আলু। তাই বলে এ তেল দিয়ে সে কখনো প্রদীপ জ্বালানোর কথা ভাবেনি। দীপাধারের জন্য আলাদা তেল।এবার শীতে যে তেল পেয়েছিল তার কিছুটা হয়তো এখনো তার ঘরে খুঁজলে পাওয়া যাবে। যখন জানলাগুলো খোলা থাকে। অথচ আনন্দদা দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়েন তখন বুঝতে হবে ঠিক পাড়ার মধ্যে নয়, পাশের পাড়ায় অথবা আরো একটু দূরে কোনো কাজ সেরে ফিরবেন কিছুক্ষণের মধ্যে। ---আমার সবাইকে বলাই আছে, যখন জানালাগুলো সব বন্ধ থাকবে এদিকে দরজাতেও তালা ঝুলছে তখন বুঝতে হবে আমার চট করে ফিরে আসারকোনো সম্ভাবনা নেই। আমি সত্যিই বেরিয়ে পড়েছি। একেবারে সেই রা ত্তিরে ফিরব। তাঁর বিছানার ওপর আজকেরখবরের কাগজ পড়ে আছে। বড়ো বড়ো অক্ষরে যে খবরগুলো জানানো হয় তা বাড়িতে একবার দেখে এলেও আবার একবার দেখা হয়ে যায় নচিকেতার। শেষ রাতের বৃষ্টি সত্তেও ছোটো ছোটো হ াওয়া সত্ত্বেও সে একটা কিছু করারতাগিদে এক কোণ থেকে উঠে গিয়ে আর এক কোণ থেকে নিয়ে আসে হাতপাখা। অ ানন্দদার ঘরে এলেই হাতপাখা নাড়ানোর সুযোগ পাওয়া যায়। সে পাখা ঘোরে, বিদ্যুতের জোরে যার প্রভাব অসীম, যা খানিকক্ষণ বন্ধ থাকলেই গরমের সময় পাগল - পাগল লাগে, তা এত বছরের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও এই ঘরে এসে ত

ার কেরামতি দেখানোর সুযোগ পায়নি। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গপ্রার্থী কেউ বীভৎসভাবে ঘামতে ঘামতে বলেও ফেলেছে কখনো --- আপনাকে একটা পাখা উ পহার দিতে বড়ো ইচ্ছে করে। অপরাধ নেবেন না। যাঁর পরনে ধুতি এবং যাঁর ঊর্দ্ধাঙ্গে উপবীত ছাড়া আর কিছু সেই মুহূর্তে অনুপস্থিত তিনি বক্তার দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে বলেছেন --- আপনাদের কষ্ট হয় বুঝি, কিন্তু আমার তো বেশ চলে যায় এতেই। শুধু শুধু বোঝা বাড়িয়ে কী লাভ বলুন তো ? উত্তর দেওয়া শেষ করেতিনি হাতের পাখায় এক এক হিন্দোল আনতে সক্রিয় হন যা দেখে একটু আগে যিনি উপচিকীর্ষু হতে চেয়েছিলেন তিনি শেষে নীরব হতে চাওয়াটাকেই শ্রেয় মনে করে গুটিয়ে নিতে থাকেন নিজেকে।

আনন্দদা যেদিকে মাথা রেখে শয়ন করেন তার ঠিক উলটোদিকের দেয়ালে একটি ছবি বাঁধানো আছে। ছবিটা এখন যতটা বড়ো প্রাথমিক অবস্থায় তার চেয়ে অনেক ছোটো ছিল, মনে পড়ে। ---আমার বাবার একটা ছবি অনেক কষ্টে উদ্ধার করেছি। এটাকে একটু বড়ো করে বাঁধিয়ে নিতে পারলে ওইদিকের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখব। তাতেমস্ত সুবিধে। কী বলুন তো। ঘুম থেকে উঠে চোখ মেলেই ছবিটা দেখে নিতে পারব। বাবার সঙ্গে আমার খুব যোগাযোগ ছিল। বেশ কয়েক বছর হলো সেই যোগসূত্রটা যেন হারিয়ে গেছে মনে হয়। বড়ো করা যাবে তো ? যা করার আপনাকেই করতে হবে। যা খরচ লাগবে সেটা শুধু আপনার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। আনন্দদা যাঁর আত্মজ তাঁরযে বয়সে দেহাবসান হয়েছে, বছর দশেক আগে সেই বয়সটা পেরিয়ে এসেছেন তাঁর একমাত্র পুত্র। যদি ধরে নেওয়াহয় এই প্রতিকৃতি তিনি চলে যাওয়ার কিছুদিন আগে তোলা হয়েছিল তাহলেও বলতে হবে সকালের আলোয় এই সময়ের আনন্দদাকে মাঝে মাঝে মনে হয় এই প্রতিকৃতি থেকে উঠে আসা অস্তিত্ব নির্ঘাত। সেই চোখ, সেই নাক, সেই কপাল, সর্বোপরি সেই অবিরাম চেয়ে থাকা আপনমনে। আজ আর একবার বাঁধানো ছবিটা দেখতে দেখতে নচিকেতা সামগ্রিক স্বচ্ছতার জন্য তার একসময়ের যে সহকর্মীর কাছে কৃতজ্ঞ তার মুখ মনে করে। সে এগিয়ে এসে তারহাত থেকে ছোটো ছবি নিয়ে তাকে কেবল বড়ো ছবিতেই রূপান্তরিত করেনি, একেবারে বাঁধিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর করে ফিরিয়ে দিয়েছে তার হাতে। সে এই মুহূর্তে কোন কর্মকেন্দ্রে আছে কে জানে। বহুদিন তার সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। সে প্রবল বৃষ্টিতেও হাজির হয়ে নচিকেতার বিয়ের ছবি তুলেছিল। এমনকি সেদিনের যজ্ঞাগ্নিও তার ক্যামেরায় ধরা পড়ে নিশ্চিন্তে। তার নিজের বিয়ের আগে তার মুখ থেকে কতবার যে মায়ের গল্প শুনেছে। মাতৃময় ছিলতার জগৎ। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই ছবিটা আস্তে আস্তে পাল্টে যায়। নচিকেতার কানে আসে--- মা যা শু করেছে ভাবতে পারবি না। হরিবল। স্ত্রীকে নিয়ে অচিরাৎ সে যে বাসায় গিয়ে ওঠে তার দোতালায় আলোহাওয়ার অভাব নেই। বড়ো বড়ো ঘর। ঝুলবারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যায় সূর্যাস্তও নাকি। কয়েক বছর আগে তার মা যে গত হয়েছেন সে খবর কোনো বড়ো রাস্তা পার হতে গিয়ে জানতে পারে নচিকেতা হঠাৎ। হঠাৎ দেখা হয়ে যায় সেই সহকর্মীর সহোদরের সঙ্গে। সেটাও তো কয়েক বছর আগের কথা। কয়েক বছরের সঙ্গে কয়েক বছর যোগ করলে কে জানেকত বছর হয়। সেই সহকর্মী কি তার ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে বুঝতে পারে, সবই আদতে ছবি এবং এক চির বিবর্ণতা ছাড়া আার এক ছবি বর্ণময় হয়ে উঠতে পারে না কিছুতেই ?

আনন্দদার মুখ থেকে অনেক কথাই শুনতে পাওয়া যায় তাঁর শরীর ভালো থাকলে। অনেকদিন ধরে তাঁর মাথায়, কানে এবং ঘাড়ে একটা যন্ত্রণা হয়। অথবা বলা যায় এই তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে বিরাজ করে সেতুরূপে যন্ত্রণা।যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখন একটা বড়ি জল দিয়ে খেয়ে নিয়ে হাতের ওপর মাথা রেখে তিনি খাটের ওপর শুয়ে পড়েন। ---নচিবাবু, আপনি যাবেন না, একটু বসুন। আমি একটু গড়িয়ে নিয়ে ব্যথাটাকে সামলে নিই। তারপর চা খেয়ে এসে আমরা কথা বলব। নচিকেতার স্বীকার করতে বাঁধা নেই, জীবন যতই অনিত্য হোক তিরিশ বছরেরও বেশিসময় ধরে সকালবেলায় দুজনের এই চা খেতে যাওয়ার ব্যাপারটায় ঘুণ ধরেনি একটুও। ইতোমধ্যে আনন্দদার অবয়বে চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন খুব বেশি হয়েছে বলে মনে হয় না কিন্তু। নচিকেতার অবয়বে পরিবর্তন এসেছেপ্রচুর। সে গোপনে আয়নার সামনে যখনই দাঁড়ায় তখনই বুঝতে পারে শুধু ত্বকে নয় দেহকোণেও বিরাজ শু করেছে বিরহবেদনা। তার ছেলেবেলায় একজন দুঃস্থ ভদ্রলোক তাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে এসে তাকে শিখিয়ে যেতেনযোগ - বিয়োগ - গুণ - ভাগ। তাঁর মুখের দিকে মাঝে মাঝে তাকানো যেত না এতটাই নির্জল হয়ে থাকত সেই বলয়।রোজ দাড়ি কামাতে না পারার অক্ষমতার সঙ্গে গূঢ় কোনো অচরিতার্থতা মিশে কেমন যেন করে রাখত ক্ষেত্রটাকে। সেই অবস্থাটা সে আজ খুঁজে পায় নিজের মধ্যে। তার রোজ দাড়ি কামানোর সামর্থ্য থাকলেও সে দাড়ি কামায় না। বহু বছর ধরেই সে শ্মশ্রুময়। সেই শ্মশ্রুর মধ্যে কেমন এক নির্মম ধবলতা

এসেছে। একেবারে সামনের দিকের কয়েকটি দাঁত হয়েছে বৃন্তচ্যুত। মুখপত্রে এমন কোনো রং এসে বাসা বেঁধেছে যার সঙ্গে কোনোরকম আত্মীয়তা সম্ভব নয়। ফলে নচিকেতা বুঝতে পারে সে আনন্দদার থেকে অন্তত পনেরো বছরের ছোটো হওয়া সত্ত্বেও এই তিরিশবছরেখুব সূক্ষ্ম অঙ্কের হিসেবে তাদের বয়সের পার্থিক্যটা আবার নতুন করে নির্ণয় ককরার সময় এসে পড়েছে।

কত যে চায়ের দোকান পালটাতে হলো এক এক করে। একেবারে গোড়ার দিকে আনন্দদাকে সঙ্গে নিয়ে নচিকেতা যে দোকানের ভেতরে অন্ধকারে ঘেরা আসনে গিয়ে বসত সে দোকানটা যার ছিল সে নিজের হাতেই তৈরি করত ঢাকাই পরোটা। কতরকম ভাঁজ ছিল ময়দার। ভাজার দায়িত্ব ছিল তার বাবার হাতে। দুজন কর্মচারীর সঙ্গে সমানতালে খাটতে খাটতে যথাসময়ে সে দুজনের হাতে তুলে দিতে চা। অস্বীকার করে লাভ নেই, ব্রাহ্মণসন্তান হয়েও বড়ো উনুনের ধারে লুঙি পরে বসে ঘামতে ঘামতে যার দুটো হাত ময়দার তালে রূপ ফোটাতে পারত অবিরাম,তার হাত থেকে পরিপূর্ণ ভাঁড় গ্রহণ করতে ভালো লাগত বেশ। সে যতটা কাজ করত ততটাই কম কথা বলত এবং তার মুখের হাসিও থাকত অচ্যুত। একদিন চা দিয়ে ময়দার তাল সরিয়ে রেখে সে আনন্দদার পাশে বসে তার দুঃখের কথা বলেছিল। তার একমাত্র সহোদর যায়নি। --- ঠাকুরমশাই, আপনার কী মনে হয় ? ও ভালো আছে তো ? চিঠি রেখে গেছে। তাতে লিখেছে যেদিন দাঁড়াতে পারবে সেদিন ফিরবে। আপনার কী মনে হয়, ও ফিরবে তো ? কেনযে এমন করল বুঝতে পারলাম না। এর তো খাওয়াপরার কোনো অভাব ছিল না। মাঝে মাঝে দোকানেও এসে বসত। আপনারা দেখেছেন। আমি তো ওর দাদা। কী যে করব কিছুই ভেবে পাচ্ছিনা। কী করা যায় ঠাকুরমশাই ?আনন্দদার মুখের দিকে যে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে তাকিয়ে নয়, দূরের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠেছিলেন--- যে স্বেচ্ছায় গেছে তো গেছে অনেক ভেবেচিন্তেই। তাই নতুন করে আপনি আর ভাবনাচিন্তা করবেন কেন? ফেরারকথাটা তো বাদ পড়েনি। সময়টাই তো বড়ো কথা। সময় হলে কিন্তু ফেরাটাও সম্ভব হবে, দেখবেন। যাকে কথাগুলোবলা হলো সে কতটা শান্ত হওয়ার উপকরণ পেল বলতে পারবে না নচিকেতা। শুধু সে বলতে পারবে একটি দৃশ্যের কথা। বেশ কয়েকবছর অতিক্রান্ত হয়েছে। যে ঢাকাই পরোটা বানাত দাপটের সঙ্গে সে তা বানাতে বানাতেই কখন যেন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ধার নিয়ে ভাড়ার গাড়ি কিনেছে। সেই ধার শোধ করে নতুন করে ধার নিয়ে পণ্যবাহী গাড়ি। সেই ধারও শোধ করেছে যথাসময়ে। তারপর হঠাৎ একদিন তার দোকান থেকে চা ও ভাজাভাজির সমস্ত সরঞ্জাম সরিয়ে আলমারি আর চেয়ার - টেবিল। আলমারিতে ছড়িয়ে আছে যে কোনো উৎসব - বাড়িতে কাজেলাগতে পারে এমন সব জিনিসপত্র। তার অধীনে যে সব রান্নার ঠাকুর আছে, ঠাকুরের সহকারী আছে তাদেরউৎসবের দিনে সাতসকালে বাসনকোসন নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিনায় ছড়িয়ে পড়ার মুহূর্তে প্যান্ট আর হাতকাটা জামা পরে বিনয়ের সঙ্গে উপস্থিত থাকে সে। শেষ মুহূর্তে দেখে কোনোকিছু বাদ পড়েছে কিনা। তারপর হেসে নির্দেশ দেয়---যাও বেরিয়ে পড়ো। দুগগা, দুগগা। বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন, গৃহপ্রবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জন্মদিন আর বিবাহবার্ষিকী।যত উচচতা বাড়ে বহুতলের তত উৎসবও পায় বহুস্তর। এমনকী শ্রাদ্ধের মধ্যেও নিয়মভঙ্গের লক্ষ্ম সে তাকেকরেতোলে উৎসবরজনী। যেতে আসতে নচিকেতা দেখেছে এই নতুন দোকানের নীরবতা। একটা টেবিল আর দুটো চেটার আর একটা আলমারি পশ্চাৎপটে। বাইরে থেকেই দেখা যায় তার ভাড়া দেওয়ার জন্য যে সব ফুলদানি বিরাজমান সেগুলি ভাঁজকরা শতরঞ্চির সঙ্গলাভ করেছে। কতবার মনে হয়েছে নচিকেতার সে কয়েকঘন্টার জন্য একটা ঘর ভাড়া করে সন্ধের দিকে সতরঞ্চির শেষে সতরঞ্চি এনে ঢেকে ফেলবে মেঝে। ভাড়া করা ফুলদানি এনে তাতে রাখবেনিজস্ব বাগানের ফুল। জ্বালাবে কোনো অন্ধ বিক্রেতার হাত থেকে তুলে আনা ধূপকাঠি। তারপর হাত ধরে সুরযন্ত্রের সামনে বসিয়ে দেবে সেই মানুষকে যার সুরগুলো সত্যিই গিয়ে পৌঁছোবে সেই পায়ে সারাজীবনেও যাকেপ্রমাণ করা যায় না, কিন্তু যার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতি মুহূর্তে নিঃশব্দে। নচিকেতা কতদিন যেতে আসতে দেখেছে যে - হাত ময়দার তালের মধ্যে ডুবে থাকত অবিরাম সেই হাত শান্তভাবে পড়ে আছে টেবিলের ওপর। যার হাত সেআরো শান্ত হয়ে তাকিয়ে আছে পথের দিকে নিশ্চিত। সেই পথ যেখানে যাওয়া এবং ফেরা কী যে সংশয়াচ্ছন্ন, কী যে যুধ্যমান প্রতি মুহূর্তে।

কতদিন দোকানের মালিক দেখতে পেয়ে নীরবতা ভঙ্গ করে শেষে ডেকেছে নচিকেতাকে। আসুন না, একটু বসে যান। কোনো কোনো দিনের ডাকে এমনভাবে প্রাণস্তর এসেছে যে সে বাধ্য হয়েছে পথ থেকে উঠে আসতে সেই টেবিলের সামনে। যে আসলে সে দৃষ্টির সামনে এসে পড়ে চলাচল সেই আসন ছেড়ে উঠে এসে সেখানেই সে তাকে হাত ধরে সরিয়ে দেয়। সে ত

ার কোনো আপত্তি শোনে না। দাঁড়ান, গোবিন্দকে চায়ের কথা বলে আসি। সামান্য সময়ের জন্য, নচিকেতাকে সেই অ াসনে বসতে হয় যেখানে অন্ধকার নেই, অগ্নির প্রতিষ্ঠা নেই, ফুটন্ত তেল নেই, ঘাম আর ভাজাভুজি নেই এবং নেই আনন্দদা পাশে। যিনি তেলের মধ্যে ছেড়ে দিতেন ময়দার বহুকৌণিক আয়তন বেশ একটা তৃপ্তির সঙ্গে, তাঁর রূপ ঝুলছে রূপান্তরিত বিপণির দেয়ালে। মাঝে মাঝে সেই রূপ মাল্যবান হয়ে থাকে বলে কেমন করে যেন বেড়ে যায় নিস্তব্ধতা। খাঁচার ভেতর অচিন পাখি ক্যামনে আসে যায় ? এই প্রশ্ন বিস্তারলাভ করার আগেই গোবিন্দকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে যে, তার আসনে বসেই ভাঁড়ের চা গ্রহণ করে নচিকেতা। চা খেতে খেতে, বিশেষ করে ভাঁড় থেকে চা খেতে খেতে, সে বুঝতে পারে সে এমন একটা আসনে বসে আছে যে আসন প্রতিষ্ঠিত শ্রমের মর্যাদার ওপর পুরোপুরি। ফলে নচিকেতা পথের দিকে তাকিয়ে ভেতর দিকে তাকাতে গিয়ে দেখতে পায় মানুষের সোনালি স্বেদ দিয়ে জ্বলে ওঠা দীপ দিবালোকেও সক্রিয়। নির্বাণের সমস্তরকম প্রলোভন দূরে সরিয়ে দিয়ে তার অনির্বাণতাও সোনালি। সে মালিকের মুখের দিকে না তাকিয়ে শূন্যের দিকে ত াকিয়ে প্রশ্ন করে। ---পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে এদিকে উঠে আসবেন শুনেছিলাম ? এখনও কি সেখানেই আছেন? মা লিক অন্য আসনে বসে নিজের আসনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে দেয়। ---দিন, ভাঁড়টা আমার হাতে দিন। আমি রেখে আসছি। ---না না, আমি ফেলে আসছি, আপনি বসুন। ---ফেলে এলে হবে না, রেখে আসতে হবে। গোবিন্দ একটা ঝুড়ির মধ্যে সব জমিয়ে রাখে। ঝুড়ি ভরে গেলে একসঙ্গে ফেলে দেয়। না হলে ভাঁড়ের ভাঙা টুকরো থেকে ময়লা জমে য ায়। দিন, আমার হাতে দিন। যে নচিকেতার ভাঁড় যথাস্থানে রাখতে চলে যায় তার ফিরে আসতেও সময় লাগে না।--- হ্যাঁ া, আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়নি। মুখে সামান্য হাসি মুদ্রিত করে সে বলে সসংকোচে। আপনি ব্যাপারটা জানতেন। ---আমি কিছুই জানি না। তা কোথায় এলেন, কাছাকাছি কোথাও ? ---খুব কাছাকাছি। একেবারে আপনার চোখের স ামনে, আপনাকে উঠতে হবে না। যেখানে বসে আছেন সেখান থেকেই আমার ফ্ল্যাট দেখতে পাবেন। নচিকেতা যেখানে বসে আছে ঠিক তার উলটোদিকে রাস্তার গায়ে একটি বড়ো তিনতলা বাড়ির দোতলাটা দেখিয়ে দিলে প্রথমে খানিকটা বিমূঢ়ত া কারিগর ! আর দোতলাটা তার দোকানের এত কাছে যে, যে - কেউ যখন খুশি দোতলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলে নিতে পারবে উঁচু পর্দায় গলা তুলে নিশ্চিত। ঠাকুরদের কাজে পাঠিয়ে দয়ে সে যখন দোকানে নিষ্কর্ম হয়ে দর্শকের আসনে বসে থাকবে চুপ করে তখন শোওয়ার ঘরের জানলা খুলে চাইলে তার স্ত্রী লুকিয়ে দেখে নিতে পারবে স্বামীর অন্যমনস্কতার সেই সংহত মূর্তি। নচিকেতা বুঝতে পারে মানুষের তুলনায় ঘর বেশি এমন এক আয়তনের বিজনতার মধ্যে কার শাড়ি শুকোচ্ছে এবং উড়ছেও মাঝে মাঝে। যার বাড়ি সে নিজেই বলতে থাকে থেমে থেমে ---একটা বড়ো ঘর। তাতে বসা এবং খাওয়া দুটোরই কাজ চলবে। এছাড়াও মাঝারি আকারের তিনটে ঘর আছে। একটায় আপ াতত আমরা তিনজন আছি। মেয়ে বড়ো হলে তার তো সবসময়ের জন্য একটা ঘর লাগবে, সে কথা মাথায় রেখেছি। বড়ে হয়ে যেতে আর কতক্ষণ। এখন বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় বসে বসে ছবি আঁকছে। এরপর হঠাৎ একদিন দেখব আর বসে নেই, দাঁড়িয়ে ছবি আঁকছে। নচিকেতা জিজ্ঞেস না করে পারে না --- মেয়ের বুঝি ছবি আঁকার খুব শখ ? --খুব। তার ম াকে তো রং কেনার জন্য অস্থির করে দেয়। নচিকেতা উত্তরকালের কথা ভাবে। কেউ উত্তরকালের কথা ভেবে শেষে প্রকাশ করেছে কবিতার সংকলন। কেউ একই ভাবনা থেকে উত্তরকালে যদি প্রকাশ করতে চায় তারও পরবর্তী কালের ছবির সংকলন, তবে কি তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে পথের একদিকের দোতলার জানলা থেকে লুকিয়ে দেখা আর একদিকের দোকানের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠা অন্যমনস্কতা যা তেজপাতার গন্ধ ছড়াতে সক্ষম কোনো এক মুহূর্তে ? নচিকেতা মৌন ভ াঙে। ---আর একটা ঘর তো তবু খালিই পড়েথাকবে ? ---নাও খালি থাকতে পারে। ঠাকুরমশাই তো বলেছেন সময় হলে ফেরাটাও সম্ভব হয়। ভাইয়ের কথা ভেবে রেখেছি। ভাই কোনোদিন ফিরলে ও থাকবে আলোতেও দেখা সম্ভব নয় সবসময়। এটা বুঝতে পেরে পরে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। আর দোকানের মালিক বলেছিল ---এ রাস্তা দিয়ে গেলে মাঝে মাঝে এখানে চলে আসবেন কিন্তু। সে যে তার কথা রাখতে পেরেছে তেমন করে তা বলা যাবে না কিছুতেই। কারণ চায়েরর দোকানের খোঁজে আনন্দদাকে নিয়ে তাকে চলে যেতে হয়েছে বিভিন্ন দিকে। পৃথিবীতে সবই অস্থায়ী এই বড়ো কথাটা বোঝার অনেক আগেই সে নির্ঘাত বুঝে ফেলেছে এমন কোনো স্থায়ী চায়ের দোকান নেই যেখানে বছরের পর বছর একনাগাড়ে আনন্দদাকে নিয়ে উপস্থিত হওয়া যেতে পারে প্রতিদিন সকালবেলা।

একবার খুঁজতে খুঁজতে এমন একটা দোকানের খোঁজ মেলে যার ভেতরের বিস্তার চোখে পড়ার মতো। যারা একসময়

জমিদার ছিল তাদের জমিদারি চলে গেলেও যা অবশিষ্ট রয়ে গেছে তার চত্বরে জমিদারগিন্নির নামে স্কুল আছে অবৈতনিক, ছিল গাড়ি মেরামতের কারখানা, আছে শিবমন্দির, ছিল টালির এমন একটা ঘর যেখানে অনেকে একসঙ্গে বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে চায়ে চুমুক দিতে পারত সকাল-বিকেল সন্ধ্যায়। কতদিন আনন্দদাকেপাশে নিয়ে ওই ঘরে বসে সে টের পেয়েছে গণচেতনা। যারা গাড়ির একেবারে নীচে চলে গিয়ে চিত হয়ে খুঁজত অসঙ্গতি, যাদের হাতে লে াহা থাকত, যারা লোহা দিয়ে লোহাকে আঘাত করে শেষে আনতে পারত অয়স্কঠিন আয়তন তারা পালা করে আসত সকালবেলায় এই ঘরে পাউটি আর ঘুগনি খেয়ে চা খাওয়ার ইচ্ছে মেটাতে। বেঞ্চে বসে চা খেতে খেতে নচিকেতা লক্ষ করত তারা সকালের খিদে মেটানোর পর সকালের ইচ্ছে মেটাতে গিয়ে সঙঘবদ্ধ হচ্ছে বেঞ্চে যতটা সম্ভব। তাদের পরিচ্ছদের ময়লা ছাপিয়ে বিরাজ করত তাদের কণ্ঠ, আর তাদের কুয়াশামুক্ত অভিমত। তাদের কেউ কাগজ হাতে করে ক াগজের শিরোনামের দিকে তাকিয়ে গালাগালিও দিয়েছে অকাতরে। তার স্পন্দনে কোণের দিকে বসে থাকা নচিকেতা যেন স্পন্দিত হয়ে অন্যদিনের তুলনায় তাড়াতাড়ি চা খাওয়া শেষ লুঙ্গি ও গেঞ্জিপরা মালিকের দিকে এগিয়ে গেছে একটা বড়ে া নোট খুচরো করা যায় কিনা সেই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে। বলে রাখা ভালো যে সেই টালির ছাদের তলায় দুপুরেও খিদে মেটাতে আসত যারা লৌহযন্ত্র ব্যবহার করে তারা ছাড়াও আরো অনেকে নিশ্চিন্তে। কারণ বসার জায়গার অভাব ছিল না। বসে ধীরে সুস্থে খাওয়া যেত ডাল, ভাত, তরকারি, মাছের ঝোল কিংবা ডিমের ডালনা। তখন কেউ চা খেতে এলে তাকে বিদায় করে দেওয়া হতো তৎক্ষণাৎ। আবার বিকেলের পর থেকে জমত চায়ের আসর এবং সেটা চলত রাত পর্যন্ত একটানা। নচিকেতা জানে রাতে সেখানে ডাল, ভাত তরকারি বা ঝোলের বদলে পাওয়া যেত পাউটি আর দুধ। সে কোনো কোনো রাতে দোকানের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরতে গিয়ে দেখেছে কেউ কেউ নিঃশব্দে কেবল দুধ পান করছে বড়ো ক াচের গ্লাস মুখেব সামনে ধরে।

এই দোকান একেবারে উঠে যাওয়ার আগে একনাগাড়ে বন্ধ থাকত বেশ কিছুদিন। আনন্দদা কতবার যে নচিকেতাকে সঙ্গে করে এই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ দেখেও আবার তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন পরের দিন সকালে খুলল কিনা তা স্বচক্ষে দেখতে ! দিনের পর দিন যা আবৃত হয়ে আছে তাকে অনাবৃত দেখার সুযোগ গ্রহণ করার অভিলাষ আজও তাঁর সমানভ াবে। বাবা এবং তার দুই পুত্র কিছুদিনের জন্য কোথায় যে চলে যেত তা জানার চেষ্টা করতে গিয়ে নচিকেতা বারংবারই একটা শব্দ শুনতে পেয়েছে। সেটা দেশ। বাবা তার দুই সন্তানকে নিয়ে মাঝে মাঝে তাদের দেশে চলে যেত। যখন মাটি অ াউশ বা আমনের জন্য প্রস্তুত হতো কিংবা বাদলা বা হৈমন্তিক ধানে ভরে যেত দশমিক তখন মাটির কাছে গিয়ে দাঁড়াত ত ারা। তারা ফিরে এসে দোকান খুলে নচিকেতাদের পাশে বসে কখনো ধানের গল্প করেনি। হয়তো তাদের সে সময়ও ছিল না। কিন্তু ধানি হয়ে উঠতেন আনন্দদা। তাঁর মুখমণ্ডল ভরে উঠত হাসিতে। ---দেখুন নচিবাবু, ওরা ফিরে এসেছে। দোক ানও খুলেছে। চলুন গিয়ে বসি। যার দোকান তার কোনো ছেলেই ছোটো ছিল না। তবে দোকানের কর্মব্যস্ততার মধ্যে ছে াটছেলের এসে পড়াটা ছিল অত্যন্ত অনিয়মিত। দোকানেরপাশে পর্দা ফেলে দিনেবেলায় একটা আড়াল বানিয়ে নেওয়া হয়। সেখান থেকে কখনো কখনো ছোটোছেলেকে দেখা যেত বেরিয়ে আসতে। চোখে চোখ পড়লে সে হেসে মাথা নিচু করত। তার হাতে থাকত খাতা। ওই খাতা দেখে দূর থেকে যারা ভাবত রাতে শুতে যাওয়ার আগে বাবা আর তার দুই ছেলে হিসেবের ব্যাপারটা পাকা করে নেবে, ফেলে রাখবে না মোটেই, তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই কখনো। এই ভাবনাট াই তো এই সংসারে স্বাভাবিক। নচিকেতাও কি প্রথমদিকে অন্য কিছু ভাবতে পেরেছিল ?না, পারেনি। পারা সম্ভব নয় এত জীবিকাগাঢ় ব্যস্ততার মাঝখানে বসে। একদিন ছোটোছেলে সরাসরি তার ও আনন্দদার মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। তবে বুক ফুলিয়ে নয়, মাথা নিচু করে। তার সমস্ত ভঙ্গির মধ্যে এমন একটা লজ্জার ভূমিকা ছিল যা গ্রাম বা শহর কোনোখানেই লভ্য নয় সহজে। কিছুটা গ্রাম কিছুটা শহর মিলে জীবনযাপনের মধ্যে এনে দেয় এমন এক আয়তন যা এই লজ্জা ধারণ করার উপযুক্ত আধার। সেই আধারের প্রমাণ ছিল যথেষ্ট --কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলার ছিল। যে তারপর তাকিয়েছিল নচিকেতার দিকে সরাসরি। ---আজ নয়, এখন নয়, পরে কোনো একদিন আমার একটু উপকার করতে হবে। আমার একটু লেখা বাই আছে। যা মনে আসে এই খাতায় লিখে রাখি। একটু দেখে দিতে হবে কিন্তু। আজ নয়, পরে কে ানো একদিন। --কী লেখেন আপনি ? গল্প না কবিতা না প্রবন্ধ, কী ? ছোটোছেলে বড়ো করে তাকায়। ---সেটাই তো সমস্যা। কী যে লিখি তা আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারি না। তাই তো আপনাদের কাছে এসেছি। আমার এই উপকারটা

একটু করতে হবে। কবিতা না গল্প না প্রবন্ধ কী যে ছাই লিখছি সেটাই তো বলে দিতে হবে আপনাদের। তবে এখন নয়, পরে কোনো একদিন আমি খাতাটা দেখাব। এখানে রাতের দিকে একজন মাস্টারমশাই দুধ খেতে আসেন। শুনেছি বাংলার শিক্ষক। কাছেই কোথাও মাধ্যমিক বাংলা পড়ান। ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করে গরম দুধ খান। দু -একবার তাঁর কথা ভেবেছি। তবে সাহসে কুলোয়নি। নচিকেতা দোকানের মহাব্যস্ততার মধ্যেও শুনতে পেয়েছিল ছেলেটির সর্বনাম উচচারণে চন্দ্রবিন্দুর দ্যোতনা। রজনীতে যিনি মন দিয়ে গরম দুগ্ধ পান করেন, একটু একটু করে যিনি তারল্যের অন্তর্গত হন তাঁর এই সর্বনামটি উচচরণ করতে গিয়ে বেজে ওঠে চন্দ্রবিন্দু। পরে আর কোনোদিন ছোটো ছেলের সেই খাতা দেখার সুযোগ হয়ে ওঠেনি নচিকেতার। দোকান আবৃত দেখতে দেখতে যখন দেশের কথা মনে পড়েছে তখন এ কথা লহমার জন্যও মনে হয়নি যে, দোকান আর অনাবৃত হবে না, বরং ধূলিসাৎ হবে শিগগিরই। দোকান না ভাঙলে গাড়ি মেরামতের ক্ষেত্রটিকে অন্তর্গত করে নিয়ে বিপুল শূন্যতার মধ্যে যাদের বাড়ি উঠবে তাদের গাড়ি থাকবে কোথায় ? তাই দোকান ভাঙা পড়েছে যথাসময়ে। যথাসময়ে খাতা জমা পড়লে হয়তো বলা সম্ভব হতো গল্প না প্রবন্ধ না কবিতা আদতে কীসের ছায়া পড়েছে কোথাও। নাকি দম্পতির মতো, গ্রাম আর শহরের মতো, কিংবা শালপিয়ালের মতো মিশে আছে কবিতা আর গল্প, কখনো প্রবন্ধ সেইসঙ্গে। নচিকেতা পথ দিয়ে যেতে যেতে লৌহলিপ্ত বাহুগুলো আর দেখতে পায় না। তার বদলে দেখে স্টিয়ারিংয়ে মেতে থাকা হাত। ঠিক সেই জায়গা দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নেওয়া হচ্ছে যেখানে আনন্দদা তাকে পাশে নিয়ে বসে ধানি হতেন। বাদলা বা হৈমন্তিক ফসলের সঞ্চয়াগার থেকে বেরিয়ে আসত হঠাৎ খানিকটা বর্ণ।

আনন্দদার গোটানো বিছানা যে খাটে, যে খাটে বসে আছে নচিকেতা সেই খাটের তলায় একটা টিনের বাক্স আছে বেশ বিবর্ণ অবস্থায়। খাটটার যে দিক দেওয়ালে কাছে সেই দিকে বাক্সটা এমনভাবে বসানো যে একটু অসাবধান হলেই চোট লাগতে পারে পায়ে। আনন্দদা মেঝেতে বসে খাটের তলা থেকে বাক্স টেনে এনে তাঁর কাজ সারেন। কিন্তু কাজ শেষ করে খাটের তলায় সেটা সরিয়ে রাখার সময় তার পুনর্বাসন নিয়ে ভাবেন না খুব একটা। ফলে তার ভাগ্যে অনেকটা খাটের ছায়া মিললেও পুরোটা মেলে না কখনোই। বাক্সের যে অংশটা বেরিয়ে থাকে সেই অংশে ধাক্কা লেগে একবার রক্তও ঝরেছে তার পা থেকে। হাঁটু গেড়ে বসে কাগজ পড়তে পড়তে কেবলই স্থান পরিবর্তনের একটা ইচ্ছে জাগে। তখন দেখা যায় নিজেরই অজান্তে কখন যেন খাটের একদিক থেকে আর একদিকে যাওয়ার চাপে একেবারে হাজির হতে হয়েছে প্রান্তসীমায়। ফলে যে দিক থেকে খাটে ওঠা ঠিক তার উল্টো দিক থেকে নেমে পড়ার পেছনে একটা ভূমিকা থাকে মাধ্যকর্ষণেরও আর যত বিপত্তি তো সেই নামতে গিয়েই। একবার রক্ত ঝরারপর কী যে সাবধান হয়ে গেছে সে।

সে খাটের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের আনন্দদাকে দেখেছে মেঝেতে বসে পড়ে বাক্স খুলতে। ফলে তার দেখার মধ্যে বড়ো বেশি সীমাবদ্ধতা এসে পড়েছে। আনন্দদা কী খুঁজছেন বা কী রাখতে চাইছেন সেটা তাঁর মুখথেকে শুনে নিয়েছে সে। কিছু খুঁজতে বা রাখতে গেলে গর্ভক্ষেত্রে একটা যে মন্থনের সৃষ্টি হয় এটা সে বুঝতে পারলেও দেখতে পায় না কখনো। টিনের বাক্সে ছেঁড়া গামছা রাখতে গিয়ে তিনি বের করে এনেছেন ধুতিপাঞ্জাবি। থলি বের করে আনতে গিয়ে তিনি একবার বেশ খানিকটা সময় ব্যয় করেছিলেন। যেমন সময় খরচ হচ্ছিল তেমন জমছিল নৈঃশব্দ্য। --আমাকে ভাদুড়িবাবু আম দিয়ে গেছেন। তাঁর নিজের গাছের আম। এত আম দিয়ে আমি কী করব ? কিছু যদি মনে না করেন আপনি কয়েকটা নিয়ে যান। দাঁড়ান, আমার কাছে একটা সাদা কাপড়ের থলি আছে। কোনো কাজেই লাগে না। এই থলিতে করে নিয়ে যান। কিছু মনে করলেন না তো ? নচিকেতার সানন্দ সম্মতি পেয়ে খাটের একদিক থেকে আর একদিকে গিয়ে সেই যে মেঝেতে বসে পড়ে বাক্স খোলেন তারপর যেন নতনেত্রই থেকে যেতে চান তিনি। নচিকেতা না বলে পারে না --- থাক না, থলির দরকার নেই। ওই তো জানালর কাছে কাগজের ঠোঙাপড়ে আছে। ওতেই কাজ চলে যাবে। ছেড়ে দিন, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। এবার কিন্তু কাজ হয়। বাক্সঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ান আনন্দদা। --- থলি নিয়ে কোনো সমস্যা নয়। ওটা তো আমি কখন পেয়ে গেছি। ওটা পাবতা তো জানতামই। কিন্তু এটা যে পাব আশা করিনি কখনো। কবে ওই বাক্সের মধ্যে ঢুকে বসেছিল। আমি ঘরের চারিদিকে কত খুঁজেছি পাইনি। আর আজ না খুঁজতেই একেবারে আমার হাতে এসে পড়ল। বহুবছর আগের বই। এখনআর পাওয়া যায় বলে মনে হয় না। শরীরের অবস্থা ভালো নয়। তবে একটু বাঁধিয়ে নিলেই কাজ চলে যাবে। দাঁড়ান, আগে বাঁধাই তারপর আপনাকে পড়তে দেব। সেই প্রথম নচিকেতা দেখেছিল ভক্তিযোগ।। একেবারে টিনের বাক্স থেকে উঠে এসে দিনের বাক্সর মধ্যে প্রতিভাত হচ্ছে ধীরে ধীরে।

ঘর বন্ধ করে বাইরে যাওয়ার সময় আনন্দদা নিচু হয়ে দেখে নেন খাটের তলা। যে খাটে তিনি শয়ন করেন শুধু সেই খাটের তলায় নয় ঘরের আর একদিকে আর একটা যে খাট আছে তার তলাও পর্যবেক্ষণের বিষয় হয়। তাঁরযুক্তি হলো, জানলাদরজা সব বন্ধ করে তিনি যে বেরিয়ে যাচ্ছেন ফিরবেন তো সেই রাতে। এতটা সময়ের দম -বন্ধ- করা বদ্ধতার মধ্যে কেউ যদি আটকে পড়ে, যদি আটকে পড়ে কোনো প্রাণী তবে তো তার প্রাণসংশয় হতে পারে। তাই বেরিয়ে যাওয়ার আগে শুধু ওপরটা দেখলেই চলবে না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিতে হবে সেইসব আড়াল যেখানে জমে আছে বস্তুপুঞ্জ, আর অন্ধকার এবং স্তব্ধতা নিশ্চিত।

আর একটা যে খাট সেখানে শোওয়ার সুযোগ কোনোদিনও পাননি তিনি। সেই খাটে চিরকালই শুয়ে থাকে সুশীলদের পুরোনো যন্ত্রপাতি, লোহালক্কড়, এমনকী বহুকাল আগে বিলুপ্ত গাড়ির দুটো চাকা। তাদের অক্ষয় শয়নের ফলে সমস্ত খাটে এমন কোনো সচ্ছলতা থাকে না যার সুযোগ নিতে পারে মানুষ। প্রতিবার ঘোরতর বর্ষার দিনে যখন ছাদ থেকে জল পড়তে শু করে, খাটের যেদিকটাতে বিছানা থাকে সেদিকে আর শোওয়া সম্ভব হয় না, এমনকী কোনদিকে কীভাবে মাথা রেখে অবয়ব ভাঁজ করে নিয়ে শোওয়া সম্ভব হতে পারে সেটা নিয়েও চলতে থাকে ভাবনাচিন্তা, তখন আনন্দদা একবার বাস্তবিকভাবে সেইসব বস্তুর দিকে তাকান যেগুলি আর একটা খাটের অস্তিত্বকে প্রায় অবাস্তব করে দিয়েছে বছরের পর বছর। যদি কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকারও জায়গা থাকত তবে মাঝরাতে সজল খাটে চুপ করে বসে না থেকে তিনি যে উঠে পড়তেন অজল খাটের ধুলোর মাঝখানে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই নচিকেতার। আজ যে বৃষ্টি হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় এতটাই অকিঞ্চিৎকর যে সে যেখানে বসে আছে সেখানে কোনো জলস্মৃতি নেই। কেবল পড়ে থাকা কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় সেই নদীর ছবি উঠে এসেছে যার গর্ভেচলে গেছে গ্রাম এমনভাবে যে কোথাও সেই গ্রামের কোনো স্মৃতিচিহ্ খুঁজে পাওয়া যাবে না। নচিকেতা জানে যে - খাট আনন্দদা ব্যবহার করতে পারেন না তার নীচে এমন অনেক ধবংসাবশেষ বর্তমান যেগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে সুশীলদের অতীতের জমিদারির শাখাপ্রশাখা। কোনো খাটেরই তলার দিকে তলিয়ে দেখার ইচ্ছে হয়নিতার। আনন্দদা তলিয়ে দেখতে গিয়ে কখনো কখনো এতটাই ভূমি স্পর্শ করতে হয় হাত দিয়ে শেষে। হাতের ধুলো হাত দিয়ে ঝেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি সামান্য সময়ের জন্য এমন একটা ভাব প্রকাশ করেন যার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠেজড়িয়ে আছে ব্রীড়া। ---যে কুকুরটার একটা পা খোঁড়া, আপনি দেখেছেন তো সেটা ইদানীং খাটের তলায় ঢুকে বসে থাকে। বেরোনোর আগে ওকে বের করে না দিলে মুশকিল।

সুশীলদের এই চত্বরে কুকুরের অভাব নেই। যারা জন্মায়, বড়ো হয় এবং গত হয় কালক্রমে, থেকে যায় তাদের বংশ। আর সেই বংশও বন্ধ্যা নয় কোথাও। ফলে নচিকেতা দেখে আসছে এত বছর ধরে এক বিমুক্ত সারমেয়প্রবাহ। যে কুকুরের এক পা খোঁড়া কিংবা বলা যায় অকেজো, তাকে দেখলেই নচিকেতার মনে পড়ে সুশীলের ছোটোকাকার কথা। অবিবাহিত ছোটোকাকার দেহ চিরকালই ভারবান ছিল। কেবল শেষের কয়েকমাসে তা ক্ষয় পেতে পেতে এমন একটা জায়গায় এসে থামে যা দেখলে গলা শুকিয়ে আসে চিরদিন। ছোটোকাকা মোটা মোটা ধর্মগ্রন্থ কিনতেন। অনেক ধর্মগ্রন্থের টীকাটিপ্পনীও মুদ্রিত দামের চেয়ে বেশ কিছুটা কম দামে বইপাড়া থেকে বহন করে নে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন নচিকেতা। আনন্দদার পাশের ঘরের ঠিক পাশের ঘরের সাতসকালে প্যান্টজামা পরে বসে থাকতেন ছোটোকাকা। তাঁর পেছনে থাকত মেহগনির একটা লম্বা শরীর যার আপাদমস্তক বইপত্রে আচ্ছাদিত। তাঁর সামনে থাকত বিশাল খাটের ওপর এমন একটা শয্যা যেখানে পাঁচসাতজন শুয়ে পড়লেও অভাব হতো না স্বাচ্ছন্দ্যের। অত পরিসরময় ক্ষেত্রে একাই রাত কাটাতেন তিনি। সকালে ভেজানো ছোলা খেতে খেতে তিনি অপেক্ষা করতনে কলা ও ডিমসেদ্ধর যেগুলি অন্দরমহল থেকে আসত যথাসময়ে। আনন্দদার ঘরে ঢুকতে গিয়ে নচিকেতা দেখেছে সামনেই পড়ে আছে কলার খোসা ও ডিমের খোলা। সামনেই একটাবড়ো ধর্মগ্রন্থ মেলে চেয়ারে হেলান দিয়ে শয্যায় পা তুলে নিজের নিয়মিত অবস্থানে অটল আছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে দুমিনিট কথা বললেই বোঝা যেত তাঁর হাসি এবং তাঁর রাগ যাওয়াআসা করবে মুহুর্মুহু। এবং কোনো গ্রন্থের খোসা বা খোলাই অপসারিত হবে না তাঁর দ্বারা। সামনে বই মেলে ধরে তিনি কী পড়তেন, কেবল অক্ষরই পড়তেন কিনা এ নিয়ে নচিকেতার যে সংশয় তা আর এ জন্মে মুছে যেতে পারবে না কখনো? কখন বই খুলতেন এবং কখন বই বন্ধ করতেন, ব্যবধানটা কতটা ক্ষণস্থায়ী তা বুঝে ওঠার আগেই নচিকেতা বুঝতে পারত ছোটোকাকার বেরিয়ে পড়ার সময় হয়েছে এবং বাইরে বেরিয়েই তাঁর প্রথম কাজ হবে মিষ্টির দোকানে বসে প্রলোভিতহওয়া ক্রমান্বয়ে। তার ফলে তাঁর হাতে যে নোনতা

এবং মিষ্টির নতুন নতুন সংকলন উঠে আসত রোজ এ কথারসত্যতা প্রমাণ করতে এগিয়ে আসতে পারে এখানে অনেকে নির্ঘাত।

দুপুরবেলায় ছোটোকাকা ঘুমোতেন না। তাঁর একটা ছোট্ট ছাপাখানা যতদিন জীবিত ছিল, যতদিন তিনি স্থানীয় পাউটির মোড়কের গায়ে সংস্থার নাম ছাপাতেন, কিংবা শ্রাদ্ধের বানানভুল ভরা সাদা আমন্ত্রণ পত্র ছাপাতেব্যস্ত হয়ে পড়তেন কিঞ্চিৎ, ততদিন দুপুরে তাঁকে বাইরেই পাওয়া যেত মূলত। ফলে দিবানিদ্রার কোনো প্রশ্নই আসে না তখন। এমনকী সেই সচলতার সময় কারো কারো সঙ্গে সামান্য বন্ধুত্বের সূত্রে তিনি প্রায় হাজির থাকতেন স্টুডিয়োপাড়ায়। কে কতটা সুন্দরী, আলো বা রঙের জোরে কাকে কতটা সৌদামিনী করে দেওয়া হয়, কোন নায়কের পতন শু হয়ে গেছে, অভিনয়ের জোরের থেকেও প্রণয়ের জোরে কে এগিয়ে বেশ খানিকটা, এমন সব খোঁজখবর বা পর্যালোচনায় তিনি নচিকেতাকেও শ্রোতা হিসেবে পেয়েছেন অনেকবার। হয়তো একটু আগে চলে এসেছে নচিকেতা, আনন্দদা ব্যস্ত হয়ে পড়েচেন প্রাঙ্গণের কলে যে ভিড় জমেছে তার ফাঁকফোকর থেকে জলাধার পূর্ণ করে স্নান সেরে নিতে প্রথম সুযোগে, এমন কোনো পর্বে ছোটোকাকা ত াকে ঘরে ডেকে নিয়ে কাছে বসতে বলেছেন। নচিকেতা সেই বিস্তীর্ণ শয্যার কূলে বসে টের পেয়েছে ব্যাপ্তির দোলাটা সর্বক্ষেত্রেই আসলে কেমন। ছোটকাকার দিকে মুখ করে বসলে তাঁর পশ্চাতের মেহগনি নীরব হয়েও দেখিয়ে দেয় স্থিতির সেই জগৎ যেখানে খুঁজলে পাওয়া যাবে নির্ঘাতদশমহাবিদ্যা। একদিন নচিকেতাকে পাহারায় রেখে ছোটকাকা কলা কিনতে গেলে ওই মেহগনির আয়তন থেকেইসে তুলে নিতে পারে এমন বই যার পৃষ্ঠাগুলো দুর্বল হলেও চিত্রগুচ্ছ নীরে াগ। দশ নারী দশদিক আলো করে ফুটে ওঠায় যে - কোনো অবসাদ সাময়িকভাবে হলেও লুপ্ত হতে পারে এই বিশ্বাস থেকে সে তিনি কলা কিনে ফিরে আসারপর প্রায় প্রার্থনার সুরে তাঁকে বলেছিল ---কাকা, আমি খুব যত্নে রাখব, কাউকে ধরতে দেব না, দেবেন আমাকে এইবইটা কিছুদিনের জন্যে? ছোটোকাকা তার প্রশ্নের মুখোমুখি না হয়ে তাঁর খাদ্যের মুখোমুখি হতে চান। ফলে আবরণমুক্ত হয় শাঁস। কিংবা বলা যায় ক্রমমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে গ্রহণের ক্রিয়া। গ্রহণ তথা চর্বণ। চিবোতে চিবোতে ছোটোকাকা ছোটো ছেটো মেয়েদের কথায় চলে যেতেন যারা দুপুরে চিত্রজগতে সুযোগ প াওয়ারআশায় চিরদিন আঙুলগুলোর সাহায্য নিয়েছেন। একথাও প্রকাশ করেছেন অভিমানভরে যে, সময়ে তাঁর বিয়ের জন্য বড়োদের তরফ থেকে কেউ এগিয়ে আসেননি তেমন করে। আর এই সক্রিয়তার অভাবে তাঁকে থেকে যেতে হয়েছেঅকৃতদার আজও। সাহস পেয়ে বলেও ফেলেছে নচিকেতা ---কী এমন বয়স হয়েছে আপনার? আজকাল কত দেরিতেও তো মানুষ সংসারী হচ্ছে। আপনার তো ষাটও হয়নি এখনো। ষাট হতে যে তাঁর তখনো পাঁচ বছর দেরি এই কথাটা প্রায় লাফিয়ে পড়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সেই বিপুলায়তন বিজ্ঞপ্তির কথা ভোলা যায় না। ---পাঁচবছর দেরি? তবে তো আপনি অনায়াসে বিয়ে করতে পারেন। সত্যি কাকা, অনায়াসে। পঞ্চান্ন আবার একটা বয়স হলো নাকি। তারপর নবরূপে সাহস সংগ্রহ করে সবাক হয়েছিল সে। --কিছু যদি মনে না করেন, আমার এক মাসিমার সন্ধানে নানা বয়সের পাত্রী আছে। আসলে মাসিমা ঘটকালি করেই সংসার চালান। আপনি অনুমতি দিলে আমি মাসিমাকে সামনের রোববার বলে আসতে পারি। তিনি থাকেন একটু দূরে। বাসে যাওয়া যায়, তবে ট্রেনেই সুবিধে। আট - দশটা স্টেশন। সেটা কোনো বড়ো ব্যাপার নয়। আপনি যদি সত্যিই অনুমতি দেন আমি সামনের রোববারে সকাল - সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ব। সে হবে খন। ---এই বাক্য উচচারণেব সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাংসল মুখ জুড়ে ছড়িয়ে যায় হাসি ও লজ্জা যুগপৎ। নচিকেতা তা উপভোগ করতে করতে বলে বসেছিল ---আপনার একটা ছবি হবে? আগের নয়, এখনকার। আমি মাসিমাকে দিতে পারি। মাসিমারও সুবিধে হবে তাহলে। তিনিও পাঠাতে পারবেন পাত্রীর ছবি। আছে ছবি, কাকা ?--- সে আমি স্টুডিয়ো থেকে তুলিয়ে আনব। সে সব অন্য ক্যামেরা। তার ছবির জাতও আলাদা। হ্যাঁ, তুই যেন একটু আগে কী বলছিলি ? কী যেন একটা চাইছিলি একটু আগে ? নচিকেতা ভয়ে ভয়ে দশমহাবিদ্যার কথা বলে। ছোটোকাকা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান মেহগনির রাজত্বে। বইটা কোথায় আছে জানতেচান। সেদেখিয়ে দিলে লাল মলাটের বইটি হাতে তুলে নিয়ে তিনি পৃষ্ঠা উল্টে উল্টে ছবি দেখে যান এক এক করে। তার চোখের সামনে এক এক করে আসতে থাকে দুর্গার দশটি প্রকাশ ---কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তার ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী কমলা। ছবি দেখা শেষ হলে তিনি সরব। ---তুই এই বইটা নিতে চাস? আমার ঠাকুরর্দার আমলের বই। বইয়ের অবস্থা খারাপ। যত্ন করে রাখবি তো ? ---কাকা, আপনি চিন্তা করবেন না। খুব যত্ন করে রাখব। কবে আপনাকে ফেরত দিলে চলবে? তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে

কী যেন ভাবতে থাকেন এবং ফিরে আসেন তাঁর আসনে। ---তুই তোর জায়গায় গিয়ে বোস, তারপর বলছি। নচিকেতা ফিরে আসে সেই শয্যাসৈকতে। তার সামনে ছোটোকাকা সমাসীন। ছোটকাকার পেছনে সমাসীন গ্রন্থসমাজ। ছোটোকাকার মুখ ভাবলেশহীন এবং হাতে ধরা আছে সেই লাল পুস্তক। ---কবে আমাকে ফেরত দিলে চলবে এই কথাটা জানতে চাইছিলি তো? তবে শোন, বলি। ঠিক নিরানববই বছর বাদে ফেরত দিবি। একদিন আগেও নয়, একদিন পরেও নয়। কী বললাম বুঝতে পারছিস তো? তোকে আমি এই বইটা নিরানববই বছরের লিজে দিলাম। এতটা আশা করেনি নচিকেতা। সে বলে ফ্যালে ---কাকা, কলম দেব? আমাকে যে দিলেন একটু লিখে দিন বইতে। স্মৃতি হয়ে থাকবে। --- শোন, তোকে একটা কথা বলি। শম্ভুনাথের মুখের কথাই সব। লেখালেখির প্রয়োজন পড়ে না। তো ইচ্ছে হলে তুই আজকের তারিখ দিয়ে ছোটোকাকার উপহার বলে লিখে রাখতে পারিস। বাড়ি ফিরে বাংলা তারিখ দেখে লিখে রেখেছিল সে।

ছোটোকাকা ভাইপোদের কথা বলতেন। সুশীল ও সুনীলের কথা তাঁর আলোচনায় এসেছে বহুবার। জমিজমার ক্ষেত্রে তারা এমন সব কাজ করে ফেলেছে যার মধ্যে খুব একটা স্বচ্ছতার ব্যাপার থাকছে না। থাকছে মূলত কাকাকে বঞ্চিত করার নতুন নতুন অভিসন্ধি। তাঁর বক্তব্যের সারাংশ করতে গিয়ে এটাই মনে হয়েচে তার। তিনি জমিজমার সুত্রেই কয়েকদিনের জন্য অদৃশ্য হতেন মাঝে মাঝে। শোনা যেত তিনি যেখানে গেছেন সেখানেই একসময় তাঁদের মূল জমিদারি ছিল। যে সব গ্রামের তাঁরা প্রায় অধীশ্বর ছিলেন কদিন সে সব গ্রামের ধুলো মেখে তাঁর নিজেরঘরে ফিরে এসে তিনি আবার কোলের ওপর বই রেখে প্রথম দফার জলখাবারের অপেক্ষা করতেন। সেই প্রত্যাবর্তনের বিভা ধারণ করে তিনি তাকে তাঁদের জমিদারির সেই জলটুঙির বর্ণনা দিতে গিয়ে ব্যবহার করেছেন একবারে নিজের ভাষা। তিনি যে দেশে গেলেই সাঁতরে চলে যান সেই ঘরে যা জলের মাঝখানে পদ্মবৎ ফুটে আছে, সে কথা জানাতে গিয়েও তিনি এনে ফেলেছেন সুশীল ও সুনীলের গতিবিধির কথা যা তাঁর কাছে মনে হয়েছে যথেষ্ট সন্দেহজনক। ---কতদিন আর সাঁতরে জলটুঙিতে যেতে পারব জানি না। ওখানেও শুনি গুণধর ভাইপোদের চোখ পড়েছে। নচিকেতা শীতের দিকে কোনো এক বছরে অফিসের চড়ুইভাতি সূত্রে সেই জলটুঙির সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়ে খুশি হয়েছিল খুব। এত তারল্যের মাঝখানে একটাই রূপ। তা ভাসমান সংসারের। চৌবাচ্চা থেকে মগে করে জল নিয়ে স্নান করতে করতে দিন চলে গেছে। তার আর সাঁতার শেখা হয়নি। যারা দিগ্‌দিগন্তরে অবগাহন স্নান করে জলের দোলায় দুলতে থাকে কিংবা চলে যায় জলপথ ধরে আপনমনে, তাদের দেখতে দেখতে কত যে মধ্যাহ্ন আর কত যে দিনাবসান সর্বজনীন থেকে ব্যক্তিগত হয়ে উঠেছে কে তার হিসেব দেবে। যারা ঠাকুরের হাত থেকে মাংসের নমুনা নিয়ে চেখে দেখছিল রান্না কতটা উতরেছে চাদের পেছনে রেখে সে একাই এসে দাঁড়িয়েছিল কূলে। কোথাও কোনো নৌকা না থাকলেও সে সেই স্বাদে পৌঁছে গিয়েছিল যা জল ও স্থলের অবিরাম ও নিশব্দ বন্ধনের।

যত বছর আগেই হোক না কেন দিনটা তো মরেনি, হারিয়ে যায়নি বিস্মৃতির উলুবনে। নচিকেতার চাকরি পাওয়ার চিঠি যেদিন হাতে এসেছিল সেদিন তাকে তো যেতেই হয়েছিল আনন্দদার কাছে। শুধু জীবনের প্রথম চাকরি বলেই নয়, আরো কারণ ছিল এই ছুটে যাওয়ার পেছনে। চাকরিটা যেমন নিরাপত্তা তথা স্থায়িত্বের আশ্বাসে ভরা তেমন আশ্বাস কয়েকমাস আগে প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকেই দিয়ে যাচ্ছিলেন আনন্দদা। ---আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, খুব বেশি দেরি নেই, আপনি এমন একটা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন যেটা বেশ বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। আপনার কোনো দিক থেকেই কোনো অসুবিধে হবে না। একটু অপেক্ষা কন। তার চোখের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি এ কথা পরেও বলেছেন কয়েকবার। শুধু তাই নয়, সে চিঠি আসার কয়েকদিন আগে যে বাংলা নববর্ষ আসে তার প্রথম দিনের প্রাতঃকালে তাঁকে প্রণাম করে উঠলে তিনি বলেছিলেন একেবারে নচিকেতামুখী হয়ে এমন কথা যার মধ্যে ছিল একটা জলটুঙির বলয়। ---আমি মার কাছে কোনোদিন কিছু চাইনি। আজ নতুন বছরের ভোরে কিন্তু চেয়ে ফেললাম। আপনার কিছু একটা অবিলম্বে হোক এটাই চেয়েছি আজ এটাই প্রার্থনা করেছি। এই প্রার্থনার বিষয়বস্তু জানার পর নচিকেতা ভাবের দিক থেকে সমৃদ্ধ হলেও যুক্তির দিক থেকে এগোতে না পারায় নীরব থাকার চেষ্টা করেছিল সারাক্ষণ। যুক্তি তাকে অনেক স্বস্তির ক্ষেত্র থেকে টেনে নামিয়ে অনেক অস্বস্তির জলাভূমিতে ছেড়ে দিয়েছে। সে জানে বাস্তবের ভার বাস্তবের জ্বালা কী পরিমাণ শেষপর্যন্ত। যে সংসারে তিনবছর ধরে নেই উপার্জনশীলব্যক্তি একজনও, যে সংসার চলে পেনশনবঞ্চিত পিতার অবসরসূত্রে পাওয়া এককালীন অর্থের ভাঁড়ার ম্লান করতে করতে, যে সংসারে মায়ের নীরব বেদনার সঙ্গে বাবার সরব হতাশার সম্মিলনে কোনো কোনো

রাখালের অঙ্গ থেকে গোধূলির শেষ রহস্যটুকুও ঝরে পড়তে চায় হঠাৎ, সেখানে কারো ভোরবেলার পরার্থপর প্রার্থনা যুক্তির দেয়ালে কতখানি দাগ ফেলতে পারে ? কিন্তু বহুবছর পূর্বের এক নববর্ষ তেমন করে সু হতে না হতেই এক বিকেলে সত্যিই যখন এসে পৌঁছোল সেই আমন্ত্রণপত্র যাতে বাস্তবের কালি আছে, আছে স্বাক্ষর এমন ব্যক্তির যিনি দেশের নানা প্র ান্তে ছড়িয়ে থাকা এক সংস্থার কেন্দ্রীয় দফতরের নিয়োগকর্তা, তখন কোথায় যেন সেই নীল লাবণ্যের বাঁশি বেজে ওঠে। আর যেন তা শুনতেও পায় নচিকেতা যুক্তি আর বাস্তবের এত সব অতন্দ্র প্রহরা ভেদ করে নিশ্চিত।

সেই দিনটিতে সত্যিই চন্দ্র পেয়েছিল তার পূর্ণাবয়ব। একটু কোনো কিছুর চাপে ঘুম ভেঙে যাওয়া ছোটোকাকার। তিনি শিয়রে নচিকেতাকে পেয়ে ভয় পান। ---তুই এত রাতে। ---ছোটোকাকা, আনন্দদা তো এখনো ফেরেননি। এত দেরি হয় ? কথার উত্তর না দিয়ে লুঙিটাকে নতুন করে বেঁধে নিয়ে নতুনভাবে গজিয়ে ওঠা একটাঝোপের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন তিনি। বোঝা যায় জলত্যাগের চাপ ছিল একটু বেশি মাত্রায়। নচিকেতার অস্বস্তি হয়। তার মনে হয় তার চোখের সামনে একটা আড়াল থাকলে ভালে হতো। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই স্বাভাবিকতা থাকলেও ওই আড়ালের অভাবে এমন এক অস্বাভাবিকতা এসে যাচ্ছে যার সঙ্গে এঁটে ওঠা দায়। সে নতুন করে বুঝতে পেরেছিল একটু আড়াল ছাড়া কোনে প্রত্যক্ষত াই লাভ করতে পারে না মাত্রা। বেশি রাতের পদধবনি তাকে সামনের দিকে তাকতে বাধ্য করে। যিনি এগিয়ে আসছেন তিনিই আনন্দদা। আনন্দদা আপনমনে তাঁর ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। বারান্দার এক কোণে যার অবস্থান তাকে দেখতে না পাওয়াটাই স্বাভাবিক এ ক্ষেত্রে। নচিকেতা তাঁকে বাধা দিল না এগিয়ে যেতে। সে চেয়েছিল সারাদিনের ক্লান্তির পর যে মানুষটি ফিরছেন তাঁকে একটু সময় দেওয়া ভালো। তিনি যেখানে বাস করেন আর তাঁর কর্মস্থল যেখানে দুয়ের মধ্যে দূরত্ব অনেকখানি। তাঁকে তখন রোজ অতিত্রম করতে হতো অনেকটা পথ। মহানগরীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্র ান্তে রোজ যাওয়া আর আসার কেটে যেত কয়েক ঘন্টা। নটিকেতার সঙ্গে চা খেয়ে ভাত খেতে যেতেন বাসে চেপে দিদির ব াড়িতে। দিদির বাড়ি থেকে দুবার বাস পাল্টে তারপর ছুঁতে পারতেন কর্মস্থল। কর্মস্থলেও মুখ বুজে কাজ করার উপায় ছিল না। তাঁকে এমন কাজে লিপ্ত থাকতে হতো সারাক্ষণ যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কর্মচারীদের নানারকম স্বার্থ। অবিচ ারের নানারকম নিদর্শন নিয়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াতেন সহকর্মীরা। তিনি তাঁদের স্বার্থে কথা বলতেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। তখন তাঁর গলা যে চড়ে যেত সেখবরও নচিকেতা পেয়েছে কোনো এক প্রত্যক্ষদর্শীর মারফত। ---ভাবতে পারবেন না এই শান্ত মানুষটি দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে কতটা বলিষ্ঠ হতে পারেন। কেবল গলা চড়িয়ে আবেগ আর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে যারা কাজ সারতে চায়তিনি কোনোদিনও তাদের দলে পড়েননি। গলা উঠেছে, তবে সে ওঠার মধ্যে যুক্তিরই উত্থান বেশি। সম্ম ান দিয়ে এবং সম্মান না বিকেয়ে তিনি বহুদিন কাজ করে গেছেন সংগঠনের হয়ে। যাঁর সংসার থাকে তাঁর থাকতে পারে বা ড়িফেরার তাড়া। যাঁর সংসার নেই, কিন্তু সংগঠন আছে তাঁরও তাড়া থাকত। অফিসের পর কী করে যথাসময়ে পৌঁছে য াওয়া যায় সেই গাছতলায়, সেখানে অস্থায়ী মিষ্টির দোকানের মধ্যে ঢুকে বসে আছে চায়ের দোকান নির্বিঘ্নে । আনন্দদা নিজেই নচিকেতাকে জানিয়েছেন চা খেতে খেতে ঘনিষ্ঠ কয়েকজন কীভাবে পথের দিকে তাকিয়ে তাঁর অপেক্ষা করত রোজ। ওই দোকান থেকেই রোজ অফিসের পরে তিনি সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে চা খেতেন। আর তাঁর রাতেরখাবারের কোনে াপর্ব থাকত না। সেদিনও এবং আজও তাঁকে বাড়ি ফেরার সময় বিস্কুটের কথা ভাবতে হয়। তিনি ঠোঙা ভরে বিস্কুটকেনেন যাদের জন্য তারা চতুষ্পদ এবং তাদের গায়ের রঙ বাদামি এবং তারা আনন্দদার অনুপস্থিতিতে পাহারার কাজ করে। তঁ ার দরজার কিংবা তাঁর দরজাসংলগ্ন প্রাঙ্গণে বিশেষ করে রাতের দিকে অচেনা কেউ এসেদাঁড়ালেই তারা সমবেতভাবে ডেকে ওঠে। আর অনেক রাতে তাঁকে ফিরে আসতে দেখলে তারা ছুটে এসে তাঁকেঘিরেধরে লাফাতে থাকে এবং সেই অস্থিরতার মধ্যে যেমন থাকে আবেগ ঠিক তেমন করে থাকে বিস্কুটের প্রত্যাশা। ---এমন করলে চলে? আমাকে আগে ঘরে ঢুকতে দে, তারপর তো হবে সব। কোনোমতে ঘর খুলে খাটের তলায় রেখে তিনি তাদের মুখোমুখি হন চিরকাল। কেউ কেউ ধৈর্য না রাখতে পেরে খাটের ওপর উঠে বসে। খাটে উঠতে পারলে কাঁধে ঝোলানো যে ব্যাগ তার খুব কাছে চলে য াওয়া যায় অনায়াসে। আর ওই ব্যাগের মধ্যেই তো থাকে একটুআগের কিনে আনা বিস্কুটের সেই ঠোঙা। আনন্দদা আর ধৈর্যের পরীক্ষা না নিয়ে ঠোঙার বিস্কুট এক এক করে ফেলতে থাকেন মেঝেতে। ফলে এই অনুদান একটা প্রায় আন্তর্জাতিক সত্রিয়তা সংহত হয় কয়েক গজের মধ্যে। সবাই বিস্কুট পায় সাধারণত। কেউ যদি না পায় লাফ দেওয়া সত্ত্বেও তবে তাকে যে অভুক্ত থাকতে হবে এমন কোনো বাস্তবচিত্র নেই। আনন্দদা যে বা যারা পেল না তাদের চিহ্নিত করে নিয়ে খালি পায়েই

এগিয়ে যেতে থাকেন পাড়ায় সেই দোকানটির দিকে যার মধ্যে দোকানের মালিক ও তার স্ত্রীর সংসারও আছে। দোকান বন্ধ করে তার সেখানেই বসে গাল গল্প করতে করতে খাওয়াদাওয়া সারে। শেষে জেগেও থাকে অনেকক্ষণ। তাদেরএই জ াগরণ থাকতে থাকতেই আনন্দ কতবার যে পৌঁছে গেছেন তাদের বন্ধ হয়ে যাওয়া দোকান এবং ফুটে ওঠাআস্তানার স ামনে। তারা যে অবস্থাতেইথাকুক এগিয়ে এসে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে বাড়তি বিস্কুট অগৌনে। সেই বিস্কুট নিয়ে ফিরে এসে তিনি সারমেয়চাহিদা মিটিয়ে তবেই ছেড়েছেন পোশাকআশাক। বারান্দার এক কোণ থেকে নিজেকে প্রকাশ না করে নচিকেতা চেয়েছিল সময় নিতে। আনন্দদা বাইরের জামা আর বাইরের ধুতি ছেড়েভেতরের ধুতি যতক্ষণ না পারেন ততক্ষণ সে অপেক্ষা করবে এবং ততক্ষণ তাঁকে জানতে দেওয়া হবে না যে ঘটনা ঘটেছে---চাকরি পেয়েছে সে সত্যিই।

সত্যিই একটা আড়ালের যে কত প্রয়োজন তা আরো একবার সেই জ্যোৎস্নারাতের ঝোপের সামনে থেকে ফিরে আসা শম্ভুনাথকে দেখে টের পেয়েছিল সে। উত্থিত লুঙি যথাসময়ে না নামিয়ে কেউ যদি ঘুমের ঘোরে প্রত্যাবর্তনের বেশ খানিকট া পথ পার করে তবে কোথায় যেন সৃষ্টি হয় নান্দনিক সংকট। যারা আনন্দদার ঘরের পেছন থেকে রোজ সকালে পথ আর প্রাঙ্গণের সীমারেখা ছুঁয়ে সামনে জড়ো হয় এবং জমে ওঠে জলধারা যাদের কথার মাঝখানে, তারা যখন এক করে কলতলায় স্নান সারে তখন সেদিকে দূর থেকে চোখ পড়লেও বোঝা যায় একটা স্তরে সংগ্রাম চলছেই নিঃশব্দে এবং নিয়ত। আর সেই সংগ্রাম যে প্রত্যক্ষতার সঙ্গে অপ্রত্যক্ষতার তা আনন্দদার সকালের খাটে বসেই খোলা দরজার পথ দিয়ে সামনেটাকে দেখতে দেখতে বুঝতে পেরেছে নচিকেতা। আনন্দদার দরজাএবংসকলের কল এমন একটা কোণ তৈরি করেছে যে, দরজা খোলা রাখলেই খাটের ওপর গোটানো বিছানায় হেলান দিয়ে যে চা খেতে যাওয়ার আগে কিছুক্ষণ বসে থাকে প্রতিদিন বছরের পর বছর ধরে তাকে দেখতেই হয় তনী কিংবা বৃদ্ধার আড়ালের অভাবজনিত সংগ্রাম গায়েম াথায় জল ঢালার পর। প্রথম দেখায় তেমন কোনো অস্বস্তি চোখে পড়বে না। মানুষ জল ঢালছে মাথায় সামনের জলধার থেকে জল নিয়ে ক্রমাগত। যে তণী তার মাথা দিয়ে জল গড়িয়ে গালে পড়ছে এবং নবতর তাণ্য রচিত হচ্ছে চোখ খোলা ও বন্ধ করার সৌকর্যে। যিনি বৃদ্ধ তিনিও চাইছেন এই সুযোগ জল নিয়ে খেলা করতে খানিকটা। এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে। কে াথাও তেমন কোনো হাহাকার নেই। কিন্তু যখনই জলকে ভেতরে বাইরে দেবার কাজ শু হয় তখন অন্তর্গত জলপথ নির্ম াণের কাজটা কত যে কঠিন হয়ে উঠতে থাকে কালক্রমে তা দূর থেকে বুঝে নিতে একটুও অসুবিধে হয় না নচিকেতার। যার া চারিদিক সলাজভাবে দেখতে দেখতে ওপর ও নীচের ত্বকে জলস্পর্শ কামনা করে আড়াল গড়ার কর্মে ব্রতী হয়, তাদের পাশে অনায়াসে এসে পড়ে যারা প্রত্যহ কাগজের পৃষ্ঠায় অথবা দূরদর্শনের পর্দায় প্রতি মুহূর্তে হাসতে হাসতে ধবংস করে চলেছে আড়াল তাদেরও মুখমণ্ডল, নচিকেতার শত চেষ্টা সত্ত্বেও। ফলে তার দেখাটা আর রৈখিক থাকে না, হয়ে পড়ে বৃত্ত াকার। সেদিন জ্যোৎস্নারাতে নিজেকে শম্ভুনাথের পাশে দাঁড় করিয়ে একটা চক্রের বোধেই বোধহয় শেষপর্যন্ত উপনীত হয়েছিল সে।

আনন্দদা সেদিন বিস্কুট বিতরণ করেন নির্বিঘ্নে। বাইরের ধুতি ছেড়ে ভেতরের ধুতি পরেন এবং উপবীতকেকেবল প্রকাশই করেন না, তাকে চন্দ্রকিরণের অংশীদার হওয়ার সুযোগ করে দেন অনতিবিলম্বে। বারান্দার কোণ থেকে আত্মপ্রকাশ করে ধীরে ধীরে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল নচিকেতা। প্রকাশ করেছিল তার কর্মপ্রাপ্তির সংবাদ।তিনি তাকে তাঁর ঠিক প াশটিতে বসিয়ে হাতপাখা নেড়ে নেড়ে ভালো করে বুঝতে চেয়েছিলেন কর্মের পরিমণ্ডল। শেষে কোনো এক আড়াল থেকে বের করেছিলেন না - খোলা সন্দেশের প্যাকেট। ---আজ সকালেই এক ভদ্র লোক দিয়ে গেছেন। আমার আর খোলা সময় হয়নি। যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলি। আপনি এত রাতে এত বড়ো একটা শুভ সন্দেশ দিলেন। আমি অ াপনাকে খালি হাতে যেতে দিতেপারি না। আমিও আপনাকে এই সন্দেশগুলো দিতে চাই। নিতে হবে কিন্তু।

সন্দেশের আধার বহন করে বেরিয়ে এসেছিল নচিকেতা। তার সঙ্গী হয়েছিলেন আনন্দদা খালি গায়ে খালিপায়ে। ---রাত হয়েছে। মোড়ে সামনেটা ভালো নয় এখন। সেদিনও দুই মাতাল আমাকে ঘিরে ধরে অনেক কথা বলতে চাইছিল। শ্রোতা হবার ধৈর্য সবার থাকে না। চলুন আপনাকে মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। সে আপত্তি প্রকাশকরলেও তিনি তাতে কর্ণপাত না করে তার পাশাপাশি হাঁটতে শু করেছিলেন। পুরসভা কোথাও কোথাও সাদা আলো দিয়েছে উঁচুতে। সে অ ালোয় তাঁর নগ্ন গাত্রের উপবীত আলো সাদা মনে হচ্ছিল। সেদিন কিন্তু মোড়ের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে কোনো মাত ালের মুখোমুখি হতে হয়নি। বরং হাঁটতে হাঁটতে নচিকেতার মনে হচ্ছিল সে নিজেই মেতে উঠেছে নতুন দিনের কল্পনায়।

মোড়ের মাথায় পৌঁছে তাকে বিদায় জানানোর আগেসবে আনন্দদা বলেছেন জয় হোক ঠিক তখন সে খেয়াল করতে পারে চাকরির চিঠিটাই ফেলে এসেছে আনন্দদার ঘরে। ফলে মোড়ের মাথা থেকে আবার তাকে ফিরে যেতে হয়েছিল ঘরের মাথায়। সে যখন এক হাতে সন্দেশ এবং এক হাতে চাকরির চিঠি নিয়ে আনন্দার ঘর থেকে বেরিয়ে প্রাঙ্গণের মাঝখানে এসেছে তখন আহূত হয়েএগিয়ে যায় ছোটোকাকার দিকে। ---কী ব্যাপার বল তো? খুব খুশি - খুশি লাগছে? ---আপনি ঠিকই ধরেছেন ছোটোকাকা আমার একটা চাকরি হয়েচে। শম্ভুনাথ খবরটা শুনে জ্যোৎস্নারাত কাঁপিয়ে হেসে উঠেছিল। ---এতদিনে তুই তাহলে জাতে উঠলি? দশটা - পাঁচটা শু হয়ে গেল? বাড়ি থেকে টি - তরকারি নিয়ে বাসে উঠে ঝুলবি। লোকে বলবে অফিসবাবু। তাই না?

বর্ধিষ্ণুতা নিয়মে আসে সেই একই নিয়মে আসতে থাকে যাকে বলে ক্ষয়িষ্ণুতা সেটাই। তাকে সবসময় জানা যায় না, ধরাও পড়তে চায় না সবসময় । কোনো এক বছরের কোনো এক কর্মহীন দুরে নচিকেতা হাঁটতে থাকে বিভিন্ন পথ দিয়ে। যত হাঁটা উদ্দেশ্যহীন হয় তত বেড়ে যায় তার গতিশীলতা। একবার সে গাছপালা আর জলাশয়ের দিকে চলে যায়। একটা বেস্টনের মধ্যে প্রাকৃতিক লাবণ্য ধরে রাখার কাজ কবে প্রথম শু হয়েছিল কে বলতে পারে। সে তো দেখে আসছে এই অস্তিত্ব ছেলেবেলা থেকে। আয়তীর সিঁদুর অনেক ফিকে হয়ে এলেও আছে কিন্তু সেই সিঁথির উপস্থিতি। সেই উপস্থিতির দিকে যেতে যেতে ভেবেছিল একটা গাছের তলায় ঠিক বসে পড়তে পারবে। কিছুদূর যাওয়ার পর সে বুঝতে পেরেছিল দুপুরের গাছতলা বিজন থাকবে এমন আশা করা ভুল। তখন সে বেষ্টিত উদারতার কাছ থেকে বিদায় নেয়। কিন্তু কোথায় যাবে তা আর ঠিক করতে পারে না। শেষে সে তার চুল আর দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে ঢুকে পড়ে একটা সেলুনের মধ্যে। যে সেলুন পাহারা দিচ্ছিল আর তখনো সাবালকত্ব আসেনি। তার হাফপ্যান্টের ভেতর থেকে হাত বের করে সে কোথায় বসতে হবে তা দেখিয়ে দিয়ে বেশ জোর দিয়ে বলেছিল---একটু বসুন। দাদা এক্ষুনি এসে পড়বেন। চুলদাড়ি দুটোই তো? এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বেরিয়ে যায় সে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে রাস্তা পার হয়। কিন্তু কোথায় যাবে বুঝতে পারে না। শুধু বুঝতে পারে কোথাও অচিরাৎ স্থির হতে না পারলে বিপদ আছে। যত হাঁটা উদ্দেশ্যহীন হবে, যত বেড়ে যাবে তার গতি, তত ঝরতে থাকবে পাখিদের ডানা, মরতে থাকবে আকাশের নীল এবং সরতে থাকবে বাঁচার ইচ্ছে। সে শুনেছিল ছোটোকাকার ছোটো ছাপাখানা বিক্রি হয়ে গেছে সম্প্রতি। তিনি আর তেমন করে স্টুডিয়োপাড়াতেও যান না। বরং দুপুরে বাড়ি থাকেন সারাক্ষণ। এই শ্রুতির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার চেষ্টা করে সে একেবারে ভিন্নদিকে এগোতে থাকে গতি বজায় রেখে। ফলে সেই যে এক অজলতা দাবিয়ে রাখতে চায় সজলতার উদয়ভূমিকে কোনো এক কোণ থেকে হঠাৎ, তারও শক্তি যেন কমে আসতে থাকে কোথাও। নচিকেতা রঙের দোকান পেরিয়ে যায়, পেরিয়ে যায় যে জুতো ছিঁড়ে গেলে পেরেক মেরে ঠিক করে কিংবা চটির অগ্রভাগে চামড়া জুড়ে সেলাই করে দেয় তার স্বহস্তনির্মিত পাদুকার সারি। ফলে কোথায় যেন জেগে ওঠে শ্রমোন্নয়ন এবং পরিণতিবোধ । কিছু বুঝে ওঠার আগেই টের পায় এত অস্থিরতার দৌলতে সে শেষপর্যন্ত ছুঁতে পেরেছে সুশীলদের লোহার দরজা।

নচিকেতা ভেতরে ঢুকে বাহিরমহলে শম্ভুনাথের ঘরে পেয়ে যায় তাঁকে। দরজা যেমন পরিপূর্ণরূপে খোলা থাকে সেদিনও তেমনই ছিল। তাঁর পায়ের কাছে জমে ছিল সিগারেটের প্যাকেট এবং হাতেও ছিল সিগারেট জ্বলন্ত। পোশাকের মধ্যে এমন এক সম্পূর্ণতা ছিল যা দেখলে মনে হবে বাইরে যাবার ডাক আছে এবং তাড়াও আছে সেইসঙ্গে। কোলের ওপর একটা মোটা বই খোলা থাকলেও চোখ ছিল শূণ্য। নচিকেতাকে দেখে খাটে তুলে দেওয়া পাদুটো নীচে নামিয়ে এনে তাকে খাটে বসতে বলেছিলেন। ---অফিস নেই? ---যাইনি। ---না গেলে কেউ কিছু বলে না? তুই তো শুনি মাঝে মাঝেই অফিস যাস না। ---ঠিকই শুনেছেন। একটানা অফিস করতে আমার খুব কষ্ট হয়। মনে হয় যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। কর্তপক্ষ এ ব্যাপারে খুব যে সন্তুষ্ট হবে তা তো আশা করাই ভুল। তবে জমা ছুটির থেকেই তো খরচ করি। তাই খুব বেশি কিছু আর বলতে পারে না। শম্ভুনাথ তার কথায় তেমন গুত্ব না দিয়ে তাঁর বিয়ের কথা এনে খানিকটা গুত্ব দেওয়া ভাব এনেছিলেন। তাঁর জমা টাকার ওপর নির্ভর করে একটা নয় দুটোবিয়েও যে করা যায় স্বচ্ছন্দে সেই অভিমতও প্রকাশ করেছিলেন যথাসময়ে। যথাসময়ে এসে পড়েছিল জমিজমার কথা, ভাইপোদের অভিসন্ধির নতুন নতুন রূপ এবং তাঁকে যে পাত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়নি তেমন করে কখনো সেই অভিমানের বেগবতী ধরা। তাঁর মিলনের বিলীয়মান পটের পাশে যেন প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছিল তার বিরহের ঘনায়মান পট। সে জানে না সে কেন এসেছে, কোথায় এসেছে, কার জন্য

এসেছে। সে কেবল জানে, সে কেবল বুঝতে পারে সমস্ত চলমানতার মধ্যেই যার সুর বাজছে তার রূপ যতই বিমূর্ত হোক তার ধূপ গন্ধ ছড়াচ্ছে সারাক্ষণ। মাঝে মাঝেনচিকেতা সেই ঘ্রাণ নিতে সক্ষম হলে তার প্রাণের অক্ষমতা বেড়ে যেতে থ াকে। তাকে তখন কেবলই পথ থেকে পা রাখতে হয় টাল খেতে খেতে। এমনকী আনন্দদাকেও বুঝিয়ে বলা যায় না সেই অবস্থায় জটিলতার কথা। আর সেই জটিলতা সরলতার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত বলে এক - এক সময় তার মনে হয়েছে, মনে হয় জবা থেকে ঝরে পড়েছেকুসুম।

যে সারমেয় একটি পায়ের অক্ষমতার জন্য খঞ্জ তাকে দেখলে সত্যিই মনে পড়ে শম্ভুনাথের কথা। ভারবান শম্ভুনাথ সবার চোখের সামনেই ধীরে ধীরে হালকা হতে শু করেন। তাঁর খিদে বেড়ে যায়, বেড়ে যায় খাওয়ার পরিমাণও। বাড়ে তৃষ্ণাবে াধ এবং দুর্বলতা। কিন্তু কমে আসে সহিষ্ণুতা নিশ্চিতভাবে। রক্তপরীক্ষায় ধরা পড়ে শর্করার ব্যাপক উপস্থিতি। এই পরিক্ষ াফলকে বিন্দুমাত্র গুত্ব না দিয়ে তাঁর দিনযাপনের মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না এনে তিনি কাটাতে থাকেন সময়। ফলে একট া সময় আসে যখন আর তাঁর দিকে স্বস্তির সঙ্গে তাকানো সম্ভব হয় না আদৌ। সঞ্চিত দাড়ি বাড়াতে বাড়াতে নামতে থ াকে। চুল মাথায় আর থাকতে চায় না। নখ বড়ো হয় কেবলই এবং ত্বকে জমতে থাকা ময়লা জামা পরেও আর আবৃত র াখা সম্ভব হয় না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হতে থাকে তাঁর বাবা দেশভাগের বিপন্নতার সময়ে যে গুণী মানুষকে সপরিবারে তাঁদের ক্ষেত্রে আশ্রয় দিয়ে প্রায় গুস্থানে বসিয়েছিলেন, যে গুণী মানুষকে হারিয়েও পারলৌকিক কর্ম তাঁর নিজের জন্মভিটেতে স ম্পন্ন করে আসতে পারেনি, শোকের পোশাক পরে স্ত্রী - পুত্র - কন্যার হাত ধরে এপারে কোনোত্রমে পালিয়ে এসে তাঁদের এই জমিতে বসেই পিণ্ডদান করেছেন শেষে, সেই মানুষটির একমাত্র পুত্র এবং তাঁর ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী তাঁর ভাইপে াদের নতুন নতুন অভিসন্ধিরচনায় সাহায্য করে আসছেন ত্রমাগত। ফলে কোনো এক জনহীন নিশীথে তাঁর নিজের ঘর একেবারেই নিষ্প্রদীপ করে তিনি তাঁর সেই আয়তনময় শয্যার ওপর অথবা তাঁর চেয়ারে অধিষ্ঠিত থেকে অথবা ঘরের মেঝেতে ঠায় দাঁড়িয়ে লোমচর্ম সত্ত্বেও প্রায়াপদের মতো অপেক্ষা করতে থাকেন। আনন্দদার পায়ের শব্দ যখন আনন্দদ ার ঘরের সামনে এসেথামে তখন তিনিই তাঁর নাম করে তাঁর বাল্যসহচরের একটাডাক শুনতে পেয়ে সেই অন্ধকার ঘরের দিকে এগিয়ে যান। দ্বিতীয় ডাকও ছিল পরিচ্ছন্ন এবং অমোঘ। আনন্দদা নির্দ্বিধায় পেরিয়ে যান চৌকাঠ। তাঁকে ভেতরে প াওয়ামাত্র প্রায় কাঁপতে কাঁপতে জড়িয়ে ধরে অন্ধকার সত্ত্বেও তার মুখমণ্ডলে পৌঁছে দংশন করতে সমর্থ হন শম্ভুনাথ। ফলে রক্ত ঝরে এবং একদিন ক্ষত শুকোলেও দাগ শুকোতে চায় না চট করে। ---নচিবাবু, আমাকে কামড়ে দিয়ে সেই আবেগের চাপে শম্ভু এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল যে আমিও ভয় পেয়ে যাই। রক্ত মুছতে মুছতে ওর গায়ে - মাথায় হাতবুলোই। এই অপকর্মের কয়েকদিন বাদে এক সকালে দূর থেকে এক বেয়াড়া পোশাকের পথচারীকে দেখে লোহার দরজার দিকে যে কুকুরটি প্রথমে ডেকেউঠে তারপর তেড়ে গিয়ে সমবেত উল্লম্ফন ও ডাকের জন্ম দিয়েছিল, বারান্দায় বসে নিত্য কর্মপদ্ধতির বই হাতে করেও তাকে ঠিক চিনে রেখে দেন শম্ভুনাথ। যখন চারিদিকে ফিরে আসে স্বাভাবিকতা তখনই তার পা লক্ষ করে যে পাথর নিক্ষিপ্ত হয় তারই আঘাতে ককিয়ে ওঠে সারমেয় এবং যন্ত্রণাই তাকে শেষ চালিত করে আনন্দদার ঘরের পেছন দিকে ব্যাপ্তির মধ্যে মিলিয়ে যেতে। তাঁর ক্ষেপণের সাফল্য স্বচক্ষে দেখে হাততালি দিয়ে উঠেছিলেন শম্ভুনাথ এবং গলা দিয়েও যে বেরিয়ে এসেছিল বিকৃত আওয়াজ তার সাক্ষী নচিকেতা স্বয়ং। সুশীল ডাক্তার দেখিয়েও সুস্থ করে তুলতে পারেনি সেই আহত পাটিকে। আজ নচিকেতার মাঝে মাঝে মনে হয়এই পরিমণ্ডলে যে পাটি আর কোনো কাজে ল াগে না, যেটি আস্তেখরচের খাতায় চলে গেছে, তারই আকৃতির দৌলতে ফিরে পাওয়া সম্ভব হয় কেবল অন্তিম নয়, আদি প্রকৃতিও ছোটোকাকার। হাসপাতালে তাঁর শিয়রের কাছে আনন্দদাকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর চোখ কথা বলেছিল অশ্রুর সহায়তা নিয়ে নচিকেতা এও শুনেছে, শেষসময় ঠিক কখন এসেছিল তা কেউ বলতে পারেনি জোর দিয়ে। কারণ শেষ সময়ে তাঁর কাছে কেবল রাত্রির বিজনতা ছিল। তার মনে নিত্তর প্রশ্ন আছে আজও। ---ছিল নাকি দুপুরেরও বিজনতা সেইসঙ্গে?

---নচিবাবু, কখন এসেছেন? অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন, তাই না ? আপনি বোধহয় আজ একটু দেরি করে ফেলেছিলেন। আমি অপেক্ষা করতে করতে উঠে পড়ি। মানে উঠে পড়তে হয় একটু। কাল অনেক রাত্তিরে সুনীলএসেছিল। নু, মানে ওর বউ, একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে বলে গেল আমি যেন একটু সময় করে ওদের ঘরে যাই। আজ না হয় সুনীলের বউ হয়েছে, কিন্তু নুকে তো আমি আজ থেকে চিনি না। সেই ছেলেবেলা থেকেআমাকে মামা বলে ডাকে। ওর

মা ব্রাহ্মণকন্যা হয়েও বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে বড়ো করে তুলেছিলেন। তখন ওরা পেছন দিকটাতে থাকত। আর আমরা ছিলাম ওদের প্রতিবেশী। আমি, দিদি, মা, বাবা, ভাই। সবাই এক ঘরে। কলেরায় একইদিনে মা আর ভাইকে হারালাম। কীসব দিন গেছে। দিদির বিয়ে হলো। ওই ঘরে বসেই বাবা জামাইবাবুরহাতে দিদিকে সম্প্রদান করলেন। দিদি তো শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। এদিকে উনুন জ্বালিয়ে ভাত বসাবে কে ? বাবা তো আপনমনে থাকতেন। বলেছি তো আপনাকে সব। নুর মা বাবাকে মামা বলতেন। আমি তাঁকে বড়দি বলতাম। বড়দিই কাজের ফাঁকে এসে ভাতে ভাত রেঁধে দিতেন। কী করে ভাত-ডাল-তরকারি রান্না করতে হয় সেটা তিনি স্বহস্তে আমাকে শিখিয়েছেন সেদিক থেকে বড়দি আমার শিক্ষিকা। নু বড়দির মেয়ে। তার অসুস্থতার খবর শুনলে আমিনা গিয়ে পারি? ---কী হয়েছে নুর? এমন কথা সরাসরি জিজ্ঞেস করেনা নচিকেতা। যে এই বাড়িতে অন্তত তিরিশবছর ধরে প্রায় প্রত্যহ সকালের দিকে আসছে তার নুকে না চেনার কথা নয়। আনন্দদার পরবর্তী বাসস্থান এই পাকা ঘরের খাটে বসেই সে তো বোধহয় ভূশণ্ডির কাকে পরিণত হয়ে গেছে। সে তো এই খাটে নিজের যৌবনে বসেইদেখেছে যৌবনবতী নুকে দুহাতে ঘরের জন্য পাশ দিয়ে পেছনের দিকে মিলিয়ে যেতে। তার যৌবন তার চোখেও ছড়িয়ে পড়েছিল বলে সুনীল তার এই প্রজার হাত ধরতে বাধ্য হয় না। না বৈদ্য, না কায়স্থ, যারা মূলত জমিদার, তাদের মূলঘরে প্রবেশের পথে নুর ভেতরের বাধাওশেষপর্যন্ত জমি হারায়।

এখন নুকে সে কমই দেখতে পায়। অতীতে তার সংসারের জল বহন করার দায় ছিল। সে অতীত দূরের অতীত। দূরের অতীত খুব কাছ থেকে সজল ণুকে যখন দেখতে পেত রোজ সকালে আনন্দদার খাটে বসে তখন সামনের প্রাঙ্গনের গাছের সংখ্যা এখনকার তুলনায় কিছু বেশি ছিল নিশ্চিত। সবুজ পাতা আর লাল - নীল ফুলের তলা দিয়ে জল ফেলতে ফেলতে কোনো কুমারীর ধাবমানতা ও বিলীয়মানতা দেখতে দেখতে রোজই মনে হয়েছে, যৌবনের মধ্যে শ্রমের একাগ্রতা এসে পড়ায় যে লাবণ্যের সৃষ্টি হয় তা মহার্ঘ। সুনীল তাদের মামলা - মোকদ্দমার ফাঁকেও এই মহার্ঘতা চিনে নিতে পেরেছিল বলে নচিকেতা যেন তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকে কোথাও। মাঝে মাঝে মেয়েকেলোহার দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসে নু। কেবলমাত্র তখনই তার পক্ষে নুকে দেখা সম্ভব হয়। আগে সে মোটা ছিল না, কিন্তু সুস্থ ছিল। বারোয়ারি কল থেকে জল নিয়ে গেলেও বুঝতে কষ্ট হত না যে তার ব্যক্তিত্ব আছে। এখন সে মোটা হয়েছে কিন্তু হারিয়েছে সুস্থতা। মেয়েকে যখনএগিয়ে দিতে আসে তখন মেয়ের ব্যক্তিত্বের পাশে মায়ের ব্যক্তিত্ব বেশ ম্লান মনে হয়েছে বেশ কয়েকবার। আনন্দদার খাটে বসে নচিকেতা সেই ম্লানিমার আয়তন নিয়ে ভেবেছে ইতিপূর্বে। মেয়ে কলেজে পড়ে এবং প্যান্ট পরে কলেজে যাওয়ার সময়। ডান হাতের ঘড়ি থেকে সময় দেখতে দেখতে বাঁহাত দিয়ে মার হাত ধরে এবং হাত ছাড়িয়েও নেয় অন্তিম মুহূর্তে। অন্তিম মুহূর্তে বাঁহাত দিয়ে লোহার দরজা টেনে খুলে মেয়ে তার মার থেকে নিজেকেপুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পা রাখে পথে। কিছুক্ষণ সেই পথের দিকে তাকিয়ে থেকে বাইরের মহল থেকে ভেতরের মহলে যাওয়ার ফাঁকে আনন্দদার চোখে পড়ে গেলে এগিয়ে আসেনু। তাঁর সঙ্গে দু-চারটে কথা বলতে বলতে সে যখন আঁচলের খুঁট দিয়ে মুখ মুছে শেষে সংসারের কথা বলে তখন সত্যিই টের পাওয়া যায় যে,প্রাঙ্গণের গাছপালা ইতোমধ্যে হ্রাস পেয়েছে বেশ। সুশীল দু-চারবার বারান্দার কোনো দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে নানা কথার ফাঁকে তারঅনুজের ভার্যাকেও আলোচনার বিষয়বস্তুর অন্তর্গত করে নিতে পেরেছে সহজাত দক্ষতায়। তাদের কোনো একপড়ে থাকা জমির উর্বরতার প্রমাণ দিতে গিয়ে সে যদি মুখের ভাষায় দু-পৃষ্ঠা ব্যয় করে তবে কুড়ি পৃষ্ঠা ব্যয় করেছে সুনীলের বুদ্ধির অনুর্বরতার প্রমাণ দিতে তৎক্ষণাৎ। আর এই অনুর্বরতার পেছনে যে নুর কারসাজি কতটা তা বিশদ করতে সে একটুও ক্লান্ত না হয়ে সবাক থেকেছে অনেকক্ষণ। তার সেই বিবৃতির কোনো কোনো বাঁকেবোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে নুর কারসাজি প্রকাশ হয়ে গেলে নু ক্ষিপ্ত হয়ে তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এমন শব্দ উচচারণ করে যা বারাঙ্গনার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে অহরহ। ---দু একটা নমুনা দেব, শুনবে ? সুশীল উৎসাহ প্রকাশ করলে তাকে নিরস্ত করেছে নচিকেতা। ---ওসব শুনে আর কী হবে? শব্দেরশক্তির কথা জানো তো? ঠিকভাবে উচচারণ করতে পারলে তার মার নেই। সুশীল ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ---এই তোমার দোষ। তুমি সব ব্যাপারেই কেমন সরে থাকতে চাও। বাস্তবের তেমন মুখোমুখি হতে চাও না। ভাশুরের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে যে- মেয়েঅমন শব্দ মুখে আনতে পারে তাকে আর বধূ না বলে কী বলতে ইচ্ছে করে জানো? নচিকেতা সুশীলের দিকে এবং সুশীল নচিকেতার দিকে তাকিয়ে থাকে। ---অনুমান করো তো, কী বলতে ইচ্ছে করে। তার নীবরতাদেখে সুশীল সক্রিয় হয়। ---না, কোনো খারাপ কথা নয়। কাব্যের কথা। কাব্যি করে বলতে ইচ্ছে করে ---জনপদবধূ। এই যুগে মুড়ি - মিছরি সব একাকার হয়ে গেছে। তুমি তো এই সত্যট

ারই মুখোমুখি হতে চাও না। তোমাকে নিয়ে সবচেয়ে বড়ো ভয় তো সেখানেই। নচিকেতা নিত্তর থাকে, নিত্তর থাকাটাই সবচেয়ে বড়ো কাজ বলে মনে হয়তার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা সে কোনো দৃশ্যকেই তুচ্ছ করে সরিয়ে রাখতে পারে না। সুনীলও তো তাকেকোনো বৃষ্টির দিনে রাজপথের খুব কাছের অলিন্দের তলায় পাশে পেয়ে সেই গোধুলির চিত্র উপহার দিয়েছে যার একটা বড়ো অংশ জুড়ে যে বিরাজমান সে তার ভ্রাতৃবধুর ব্রতশেষের অন্নপাত্রে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে ভস্ম অকাতরে।

---নচিদা, মেয়ের আমার একটা বাতিকের কথা শুনেছ তো? নচিকেতা সুনীলের মুখের দিকে তাকিয়েছিল গত বছরে। সে শুনেছে সুনীলের মেয়ে বাড়ির সবচেয়ে কাছের ৰিবিদ্যালয়ে ইংরেজি নিয়ে উচচশিক্ষা লাভের জন্যভর্তি হয়েছে। সে শুনেছে সুশীলের কাছ থেকে। সুশীল যে ৰিবিদ্যালয় থেকে ভূতত্ত্ব নিয়ে উচচশিক্ষা লাভ করেছিল সেই একই ৰিবিদ্যালয়ে যে তার ভাইঝির প্রবেশ ঘটেছে এ কথা জানাতে দ্বিধা করেনি সে। এই ৰিবিদ্যালয়ে এমন একটা সময় এসেছিল যখন সম াবর্তনের অনুষ্ঠানে গ্রহণের পরিবর্তে বর্জনই হয়ে ওঠে অনেকের প্রথম এবং শেষ কাজ। তারা তাদের উপাধির অভিজ্ঞান গ্রহণ না করে তা ফিরিয়ে দেয় এই বলে যে, এইসব শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠ বঞ্চিত মানুষের সংগ্রামের পটভূমিতে একেবারেই নিরর্থক ব্যাপার। তা মানুষের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে। বিপ্লবের দীপ জ্বালানোর ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকাই পালন করতে পারে না। উপাধি বর্জন করেছিল সুশীলও। পাড়ায় এই ঘটনার পরে অনেকের চোখেই তার জন্য কিছুটা বিমূঢ় প্রশংসা জমতে দেখা গেছে কখনো কখনো। আনন্দদার সঙ্গে নচিকেতার দেখা হওয়ার কয়েক বছর আগেই সুশীল তার ভূতত্ত্বের উপাধি বর্জন করে সামান্য পুঁজি নিয়ে ব্যবসায় নেমে কিছু অর্জন করার চেষ্টা শু করে দেয়। সে বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে ঘুরে ঘুরে ক াগজ-কলম-কালির প্রয়োজন মেটানোর কাজেনিজেকে নিযুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যেত যথাসম্ভব। মাসের শেষে বিফলতাই বড়ো হয়ে উঠতে চাইত বলে কয়েকমাস বাদে সে যোগানদারের কর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে জমিজমার কর্মে ব্যস্ত হয়ে থাকার মৃতপ্রায় বাসনাকে জীবিত করে এবং সক্রিয়ও হয় আস্তেআস্তে। বলার কথা এই যে, তার সেই চাহিদা মেটানোর পর্বে নচিকেতা তার সঙ্গে পরিচিত হয় এমন এক বাণিজ্যকেন্দ্রে যেখানে নিরর্থকতা বলে কিছু থাকতে পারে না, যেখানে সঞ্চিত অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্য হয় সঞ্চিত সুদই চিরকাল। সেই পরিচয়পর্ব থেকে আজ পর্যন্ত কতবার দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। কিন্তু কোনোবারই তার সঙ্গে ঝর্নার জন্মস্থান নিয়ে কথা হয়নি, কিংবা কথা হয়নি জলস্তর নিয়ে। আজ মাঝে মাঝে ত ার দিকে তাকালে টের পাওয়া যায় তারও জলস্তর নেমে গেছে এবং মানুষকে বাদ দিয়ে ভূবিদ্যার কোনো রঙই দাঁড়াতেই পারে না। তবে একই ৰিবিদ্যালয়ে ভাইঝি যে মোটা নম্বর নিয়ে ভর্তি হয়েছে তা জানাতে গিয়ে সেও রঙিন হয়েছিল মুহূর্তের জন্য নিঃসন্দেহে। বাড়ির সবচেয়ে কাছের ৰিবিদ্যালয়টি এখন যত ভালো ৰিবিদ্যালয় আছে তাদের মধ্যে পড়ে। ক ারো মেয়ে যদি ভালো নম্বর নিয়ে সেখানেই ভর্তি হতে চায় তবে বাতিকের কথাটা আসছে কেন তা ঠিক বুঝতে না পেরে সে সুনীলের মুখের দিকে তাকিয়েছিল গত বছরে। ---শোনেননি? সুনীলের প্রশ্নের মধ্যে এবার এসে যায় স্নিগ্ধতা খানিকটা। ---না, শুনিনি। কী ব্যাপার বলো তো ? সুনীল জানায় যে তার মেয়ে শুধু পড়তে চায়না, লিখতেও চায়। আর তার লেখা কেবল ব্যক্তিগত চর্চার স্তরে সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়ছে অনেকের কাছে। যে ইংরেজি দৈনিক দেশ ও প্রদেশ দুয়েরই র াজধানী থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে তাদের জন্মেরও অনেক আগে থেকে, তার রবিবারের পাতায় লিখতে শু করেছে সুনীলের একমাত্র আত্মজা ইভা। ---নচিদা, গত রবিবারের পাতায় ইভার লেখা বেরিয়েছে। হাতের কাছে পেলে দেখো কিন্তু। নচিকেতা দেখেছিল। তবে তার এমন অনেক সমস্যা আছে যেগুলি কাউকে ঠিক বলা যায় না বুঝিয়ে। সে খুব ভালো করে লক্ষ করে দেখেছে, বেশি ইংরেজি না জেনেও কোনো দর্শন বা আত্মজীবনীর বন্দিত অধ্যায় পড়তে গিয়ে তাকে একব ারও হোঁচট খেতে হয় না, একবারও তার মনে হয়না যে, অচেনা শব্দের চাপে তার বুঝে উঠতে থাকার সুর কেমন যেন ফিকে হয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু রবিবারের এমন অনেক পাতা তার দৃষ্টিতে এসেছে যেখানে এগোতে এগোতে পিছিয়ে অ াসতে হয় এবং সেই পেছোনোর মধ্যে থেকে যায় অজ্ঞতাজনিত পরাজয়বোধ। স্বস্তির কথা, ইভার ক্ষেত্রে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি এখনো।

ইতোমধ্যে সে ইভার যে কটি লেখা পড়ে ফেলার সুযোগ পেয়েছে সেগুলোর কোনোটাই কোনো নিজস্ব ভাবনার ওপর দঁ াড়াতে চায়নি। এই নয় যে সে লিখেছে সমুদ্রস্নান নিয়ে, এই নয় যে সে এমন কোনো দিন এঁকেছে যারমধ্যে মিশে আছে র ামধনুর প্রতিটি রঙ পরিষ্কারভাবে। তার লেখার ধারার মধ্যে আছে কেবল জানা এবং জানিয়ে দেওয়ার ধারা। বোঝা যায়

সে তথ্যসূত্রে চোখ রেখে কলম চালিয়েছে ক্রমাগত। সে মেয়েদের রূপ নিয়ে লিখেছে। কারা কীভাবে রূপরক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে তার লেখা পড়লে সেসব জানা যাবে সহজেই। তার লেখা পড়লে জানা যাবে যে-সব রোগ মেয়েদের সহজেই জড়িয়ে ধরতে চায় সে সব রোগের নাগাল থেকে কী করে সরে থাকা সম্ভব এবং সরে থাকা শেষপর্যন্ত সম্ভব না হলে কী ভাবে তাদের মুখোমুখি হওয়া যেতে পারে একটুও ভয় না পেয়ে। গত বছর জরায়ুর টিউমার নিয়ে তার একটা লেখা বেরিয়েছিল দেবীপক্ষে। বেশ মনে পড়ে প্রতিমাবিষয়ক কোনো এক রচনার নীচেই ছিল তার সেই লেখা। ওপরের লেখার মাঝখানে দশ হাত জাগিয়ে যতটা বর্ণের বলয়, যতটা প্রকাশের শিখর, নীচের লেখার মাঝখানে গোপনাঙ্গের দৌলতে অন্তরালে বিপদ নিয়ে ঠিক ততটাই মুখরতা, কিংবা ঠিকততটাইভাষা। ইভাকে এই সেদিনও দেখেছে নচিকেতা। একরাশ গ্রীষ্মের মাঝখানে ইভা এক এক করে বসিয়েছে উচচ রক্তচাপের এক - এক উপসর্গ। দেখেছে তার লেখায় তাকে পাওয়া না, গেলেও কোনো-না-কোনো ডাক্তারের ভাবলেশহীন মুখমণ্ডল পাওয়া যাবে নিশ্চিতভাবে। ইভাকে লৌহদরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার আগে নু যে তাকে আনন্দদার ঘরে কখনো নিয়ে আসেনি একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে ঠিক। কোনো কোনো বিশেষ দিনে, বিশেষ করে পরীক্ষার আগে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মা ঠিক হাজির হয়েছে তাঁর দরজার স ামনে। ---যা প্রণাম করে আয়। মামা, ওকে একটু আশীর্বাদ করবেন। ওর আজ একটা পরীক্ষা আছে। মেয়ে ঘরে পৌঁছে ানোর আগেই তার কাছে পৌঁছে যায় আনন্দদার আমন্ত্রণ। ---এসেছে, ভেতরে এসো। ইভা ভেতরে এসে নত হলে তিনি ত ার মাথায় হাত রাখেন। সেই হাতে জপের মুদ্রা ফুটে ওঠে। আর মুখে ফুটে ওঠে প্রসন্নতা। ---খুব আনন্দের সঙ্গে পরীক্ষা দেবে। কোনো বিনতি রচনা করেছে এবং যিনি বিনতি গ্রহণ করছেন দুজনেরই সাহায্যে একটা উন্মোচনের জন্ম হচ্ছে কোথ াও। মেয়ে আনন্দদাকে প্রণাম করে মার কাছে ফিরে যাওয়ার মুহূর্তে বাধা পেয়েছে মার কাছ থেকেই একাধিকবার। ---কী, নচিদার কাছে গেলি না? নচিদাকে প্রণাম করে আয়। এই কথা শুনে খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে সে বলে ফেলেছে ---আমাকে প্রণাম করতে হবে না। আনন্দদাকে করলেই হবে। মানতে চায়নি মা। ---তা বললে হয় ? যা, নচিদাকে প্রণাম করে আয়। নচিকেতা ধাবমান অবয়ব দেখে সঙ্কুচিত হয়েছে। বাধাও সৃষ্টি করেছে যতটা সম্ভব। সরে গেছে, সরিয়ে নিয়েছে পা। কিন্তু কৃতকার্য হয়নি। কৃতকার্য হয়েছে ইভা। সে ঠিক মাথা নত করে হাস্যমুখে ছুঁয়ে ফেলেছে পা এবং সেই হাত রেখেছে তার কপালে। নচিকেতাকে তখন অনন্যোপায় হয়ে তার মাথায় রাখতে হয়েছে হাত। আর্শীবাদ করতে গিয়ে টের পেয়েছে তার লেখার মতো তার অবয়বও নির্মেদ। আর এই অবস্থায় পেছনে তথ্যশক্তির একটা অভিঘাত আছে নিঃসন্দেহে। নু দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখেছে তার নির্দেশপালন। শেষে মেয়েকে সঙ্গে করে পৌঁছে গেছে লৌহদরজার দিকে। ইভার হাতে সংস ারের জলাধার নেই। তার হাতের মধ্যে আছে সেই হাত যা এক সময় বহন করেছে সংসারেরই জলাধার নিঃশব্দে। নচিকেতা আনন্দদার খাটের এক কোণে বসে তিরিশ বছরের সুযোগে দেখতে পেয়েছে হাতের বলয় কিংবা হস্তমণ্ডল। কোথ াও দ্বিভূজ, কোথাও চতুর্ভজ, কোথাও বা আবার দশভূজ বৃত্তাকারে। শম্ভুনাথ একদিন নিরানববই বছরের জন্য যে বই নচিকেতার হাতে তুলে দিয়েছিলেন তার পাতায় পাতায় আসলে ছড়িয়ে আছে হাতেরই মহাবিদ্যা। কোনও হাতের নরমুণ্ড, কোনো হাতে খাঁড়া, কোনো হাতে উৎপল, কোনো হাতে অঙ্কুশ, কোনো হাতে পাশ। আবার এমন এমন হাতও অ াছে যেখানে পাওয়া যাবে জপমালা, যেখানে পাওয়া যাবে পুস্তক, পাওয়া যাবে এমনকী শস্য ঝাড়ার পাত্র। এমন দ্বিভূজও আছে যার একটিতে মুদগর এবং আর একটিতে শত্রুর জিভ। কোনো হাতে দেখা গেছে ঢালও। আবার কোনো হাত ধারণ করে আছে অভয়মুদ্রা। যে কোনো মহাবিদ্যার ধ্যান করতে গেলে হাতকে এড়ানো যাবে না কিছুতেই। হাতের দামিনী নিয়ে ভাবতে ভাবতে নচিকেতা একথাও ভাবে, যে-সব রোগ নিয়ে ইভা লিখতে পেরেছে সেগুলোর কোনো একটাই কি শেষে নুকে জড়িয়ে ধরেছে নিঃশব্দে? সেকিছু না বলে চোখে প্রশ্ন এনে আনন্দদার দিকে তাকিয়ে থাকে। ---নচিবাবু, নুকে দেখে কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল। এতদিন মুখ বুজে সংসারের ভেতর আর বাইরেটা দুটোই সামলে এসেছে এখন কেমন যেন আর পেরে উঠছে না। ছেলেবেলা থেকেই ওর মুখে হাসি দেখে এসেছি। শত বাধার মধ্যেও ওর মুখের হাসি মিলিয়ে য ায়নি। কিন্তু আজ একেবারে অন্যরকম দেখলাম। আমাকে দেখে কাঁদছে। শেষে আমাকেই চোখ মুছিয়ে দিতে হলো। ওকে দেখে সত্যিই মনটা খারাপ হয়ে গেল। সংযমের বাঁধ ভাঙল নচিকেতার। সে আর চুপ করে থাকতে পারে না। ----আনন্দদ া, কী হয়েছে নুর? কোনো মেয়েলি রোগ? ---না না, মেয়েলি রোগ হলে তো এত চিন্তার ছিল না। ডাক্তারের কাছে দৌড়ে গেলেই একটা পথ বেরিয়ে আসত। ওসবের ডাক্তারও কম নেই চারিদিকে। কিন্তু নুর ব্যাপারটা তো একেবারে অন্যরকম।

আনন্দদা আস্তে আস্তে নচিকেতার পাশে এসে বসলেন। আপনার কাছে তো আমার গোপনীয়তা নেই তেমন। রাখতেও চ াই না কখনো। বলেই ফেলি। আপনি তো বলেন না জানি, তবু বলি, বলবেন না কাউকে। একটু চুপ করে থেকে নিজের হ াতের আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নচিকেতার পিঠে হাত রাখেন। ---মানুষের যে কত কষ্ট, কতরকমের যে সমস্যা তা আর কী বলব। নুকে দেখে আপনি বুঝতে পারবেন না যে ও অসুস্থ। চলছে ফিরছে, সব কাজ করছে। সব দায়িত্ব পালন করছে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ কেমন যেন সরে যাচ্ছে মানে ? কী হয়ে যাচ্ছে? আবার আনন্দদ া চুপ। আবার তাঁর আঙ্গুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা। কিংবা অনামিকার বুকে বুড়ো আঙুল রেখে আস্তে আস্তে পতন ও উত্থানের মধ্য দিয়ে পৌঁছে যাওয়া শেষে তর্জনীর পাদদেশে। তিনি কি ঘরের কথা বলতে গিয়ে স্মরণ করে নিচ্ছেন দিগন্তকে একবার? নচিকেতাও তার আঙুলের কাছে ফিরে আসতে চায়। শু করতে চায় দু হাতের সাহায্যে ভাঙাগড়ার খেলা মুহূর্তের জন্য হলেও। ---কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে মানে এমন ব্যবহার করে ফেলেছে যা ওর একেবারেই করা উচিত নয়। সাংবাদিকের চোখে দেখলে একটু বিসদৃশ যে লাগবে না সে কথা জোর করে দিয়ে বলতে পারছি না। এই নিয়ে বা ড়িতে অশান্তিও হচ্ছে বেশ। সুনীল জিজ্ঞেস করছিল কী করবে? ডাক্তারের খোঁজে করব কিনা। ইভার সঙ্গে পড়ে একটি মেয়ে। তার বাবার সাজানো - গোছানো চেম্বার আছে, নামডাক আছে। ইভা বলছে বন্ধুকে না জানিয়ে সুনীলকে তার বাব ার সঙ্গে কথা বলতে। তারা বাবা যদি বলেন তখন না হয় নুকে নিয়ে যাওয়া যাবে। কী জানেন নচিবাবু, নু যদি একবার টের পায় সে একজন মনের উদীয়মানা রোগিনী, কী, ভুল বাংলা বললাম না তো? তবে কী হবে বলুন তো? আমার তো মনে হয় একটু সমব্যথা, একটু সহানুভূতি নিয়ে ওর কাছে এগিয়ে গেলে ও অনেক শান্ত হয়ে যাবে। আমার তো বরং সুশীলকে নিয়ে বেশি চিন্তা হয়। ও যে কীভাবছে, কী করছে, কখন বেরোচ্ছে কখন ফিরছে কিছুই বোঝার উপায় নেই। আগে মাঝে ম াঝে বেশ রাতের দিকে ঘরে ঢোকার আগে আমার কাছে আসত। তখন শুনতাম ওর নাকি শুতে শুতে রাত তিনটে হয়ে য ায়। এখনকার কথা বলতে পারব না তখন আমার ঘরে ঘন্টাখানেক কাটিয়ে ঘরে ফিরে রান্না চাপাত। রান্না শেষ করে খেয়েদেয়ে শুতে শুতে রাত তিনটে তো হবেই। আর সব কাজই তো লণ্ঠন জ্বালিয়ে করা। সারা বাড়িতে বিদ্যুতের আলো, কিন্তু তার ঘরে লণ্ঠন। তার ধনুর্ভঙ্গ পণ ---কারো কাছ থেকে আলোর ভিক্ষে নেবে না। যেদিন সামর্থ্যে কুলোবে সেদিন একবারে নিজের নামে আলোর সংযোগ নেব। ওকে আমি কত বুঝিয়েছি, মান - অভিমান রেখোনা সুশীল। সুনীলের ঘর থেকে আলোর সংযোগ নিয়ে নাও। সে পর নয়, তোমার একমাত্র সহোদর। বেশি বোঝাতে গেলে অপ্রসন্ন হত, আপনি ওদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন। এই যে নচিবাবু সুনীলের ডাকে ওদের ঘরে গিয়েছিলাম, সুশীল কিন্তু ভালোভাবে নেবে ন া। ও ঠিক খবর পেয়ে যাবে। রাতের দিকে এসে ওর অসন্তোষ প্রকাশ করবে। আজ অনেক দেরি হয়ে গেল। চলুন, চা খেয়ে আসি।

---নচিবাবু, আপনি কিছু গভীরভাবে ভাবছেন মনে হচ্ছে ? পিঠে হাত রেখে দোকানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কাজ না থা মিয়ে প্রশ্ন করেন তিনি। --তা একটু ভাবছি, আনন্দদা। এখানে নয়, চা খেয়ে ঘরে গিয়ে বলব।নচিকেতা ভাবছিল আনন্দদার পিতার কথা। তিনি থাকলে তার বুকের কাছে যে কাগজের টুকরোটি আছে তা বের করে সেতো তাঁর সামনেই নিশ্চিন্তে মেলে ধরতে পারত। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় সে ওই কাগজের টুকরোতেই শিখে এনেছে এক মাস ধরে আকাশে যে দীপদান তার মন্ত্র। মন্ত্রের অর্থোদ্ধারের জন্য তাকে আর ভাবতেহতো না আদৌ। তিরিশ বছর ধরে সে যদি আনন্দদার ক াছে আসে তবে সংস্কৃতের সেই শিল্পীর সঙ্গে তার দেখা হবে কী করে? কারণ তিনি প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে বরণ করেছেন মৃত্যুকে। তাঁর সন্তানের মুখ থেকে তাঁর পিতার সম্পর্কে কত কথাইবেরিয়ে এসেছে বিভিন্ন প্রহরে। সেগুলির একটা নির্বাচিত সংকলন সম্পাদনা করে মনের কোনে রেখে দিয়েছে নচিকেতা। মাঝে মাঝে সেটা কোণ থেকে সরিয়ে এনে সামনে রাখার ইচ্ছেটাও যে বড়ো হয়ে ওঠে তার অস্বীকার করবে কী করে। আনন্দদার পিতাকে সুশীলের পিতামহ দুঃসময়ে শুধু আশ্রয়ই প্রদান করেননি তাঁকে কালক্রমে বসিয়েছিলেন গুস্থানেও। পত্নী ও কনিষ্ঠপুত্র হারিয়ে কন্যা সম্প্রদান করে আনন্দদাকে নিয়ে তিনি পেছনের কাঁচা ঘর থেকে সামনের এই পাকা ঘরে এসে প্রতিষ্ঠিত হন পুর্ণমাত্রায়। তাঁর কাছে যাঁরা সংস্কৃত নাটক পড়তে আসতেন তাঁদের মধ্যে একজন অন্তত উত্তরকালে নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। নচিকেতাও তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত ছাত্রজীবন থেকেই। ---তাঁর একটা বই আছে। বইটার নাম এখন আর আমার মনে নেই। সেই বইয়ের একটা আলাদা অধ্যায় তিনি লিখেছিলেন বাবাকে নিয়ে। অধ্যায়ের নাম দিয়েছিলেন। সেই নামটা কিন্তু

মনে আছে। পণ্ডিতমশাই। বইটা আমার কাছে ছিল অনেকদিন। কে যে শেষে নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দিল না কে জানে। আপনি একটু খোঁজ করে দেখতে পারেন। যদি খোঁজ পান নিজেই সেই অধ্যায় পড়ে নিতে পারবেন। আমার মুখের কথা আর বিশ্বাস করতে হবে না। বাবার জীবদ্দশায় আনন্দদা যতবার স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়েছেন ততবারই ব্যর্থ হয়েছেন অল্পের জন্য। শেষে বাবা তাঁকে নিরস্ত করেন। পিতার গুণমুগ্ধ এক বৃদ্ধের মাধ্যমে তাঁর যে চাকরি হয় সেই চাকরি করতে করতেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন যথাসময়ে। তিনি যেখানে চিরকাল চাকরি করে এসেছেন সেখানে বিমানের যে গ্রন্থাগার তার কোণে বই হাতে করে তাঁকে কাটাতে হয়েছে বছরের পর বছর। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারের বিখ্যাতি ছিল বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো শাখায়। তাঁর বাড়ির বিরাট বাগানের শাখায় শাখায় যে ফুল ফুটে থাকত সকালবেলায় তা তুলতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর হাতে ধরা পড়ে যাওয়া একাধিক কর্মীর চাকরি চলে গেছে মুহূর্তের মধ্যে। ---এমন স্বেচ্ছাচার ছিল একসময়। একসময় আমরা সমবেত হই। প্রতিবাদ করি। আন্দোলন গড়ে তুলি। আজ এই যে এত বড়ো সংগঠন দেখছেন, এত সব নিয়মের প্রতিষ্ঠা দেখছেন, এ সব তো আর রাতারাতি হয়নি। আমরা ইট মাথায় দিয়ে রাত জেগেসবকিছু তিলে তিলে গড়ে তুলেছি। যাঁরা বড়ো, যাঁদের দেশ জুড়ে এত নামধাম তাঁদের অনেককে কাছ থেকে দেখারসুযোগ পেয়েছি। নচিবাবু, কী যে হতাশ হয়েছি তা আপনাকে আর কী বলব। আবার দু-একজন এমন মানুষও দেখেছি, যাঁরা যত বড়ো ততটাই সরল, ততটাই সাধারণ। তাঁরা আমাদের মধ্যে নেমে আসতেন। আমাদের কাছে বসে আমাদের কথা শুনতেন। তাঁদের স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার কথাও বলতেন একেবারে ছেলেমানুষের মতন। তাঁদের নাম কিন্তু আজও দেশ - বিদেশের জ্ঞানীগুণীরা স্মরণ করেন।

যাঁরা স্মরণীয় তাঁদের কথা বলতে বলতে তিনি এমন একজনের কথা বলেছিলেন যাঁকে আড়ালে সবাই পাগলা সাহেব বলত। পূর্ণিমার রাতে অফিসে আটকে পড়া আনন্দদার কানেও ভেসে এসেছে সেই আত্মভোলা জীববিজ্ঞানীর বেহাল মূর্ছনা। যারা যোগ্যতম তারাই টিকে থাকবে---এই মতবাদের আড়ালে আসলে হিংসা ও সংঘর্ষের যে জয়ধ্বনি বিরাজমান তার সম্পর্কে যে কতিপয় বিজ্ঞানীর মনে সংশয়ের জন্ম হয় তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। তিনি জানতেন, ক্রমবিকাশের তত্ত্বের মধ্যেই এমন কিছু দুর্বলতা লীন হয়ে আছে যেগুলি আস্তে আস্তে কারো কারো কাছে ক্রমবিকশিত হচ্ছে নিশ্চিত। তিনি জানতেন সাইবেরিয়ার পূর্বাঞ্চলে এবং মাঞ্চুরিয়ার উত্তরাংশে কীভাবে পাওয়া গেছে প্রাণীজগতের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের পরাকাষ্ঠা, পূর্ব আফ্রিকায় কীভাবে কৃষ্ণসার মৃগকে বিপদাপন্ন হবার আগেই সতর্ক করে দিয়ে যাচ্ছে জেব্রা, হাতির বিরাট কান ও বিশেষ শ্রবণশক্তি সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টির স্বল্পতা তাকে যাতে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে না পারে তার জন্য পাহারা দিয়ে যাচ্ছে জিরাফেরা কীভাবে। আর জিরাফ ও হস্তীর এই সহযোগিতার থেকে খানিকটা দূরে গেলেই দেখা যাবে গণ্ডারের পিঠে বসে এক ধরনের পাখি তীক্ষ্ণ চিৎকার করে এবং চঞ্চু দিয়ে আঘাত করতে করতে গণ্ডারকে শিকারির উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে দিচ্ছে এবং গণ্ডারের ত্বকে ছড়িয়ে থাকা রক্তপায়ী পোকামাকড় খেয়ে জীবনধারণ করছে। ---জানেন নচিবাবু, তাঁকে যতটা দেখেছি তাতে আমার এই বিশ্বাস প্রবল হয়েছে যে, আমাদের প্রকৃত জ্ঞানের যোগফল কত ছোটো তা তিনি ধরতে পেরেছিলেন। পাগলা সাহেব তাঁকে বলেছিলেন---থামলে চলবে না, এগিয়ে যেতেহবে। তখন তাঁর বাবার দেহাবসান হয়েছে। শম্ভুনাথের কাছ থেকে অনেক পরে নচিকেতা পেয়েছে সেই অবসানজনিত তথ্য। বাবার দেহ খাটের ওপরে পড়ে থেকে যখন প্রাণহীন হলো সত্যিই তখন ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন আনন্দদা। বাবাগো এই ধ্বনি, বিশ্বাস করতে নচিকেতা, উঠে এসেছিল সেই ধ্বনিমণ্ডল থেকে যেখানে সবকিছুই আলিঙ্গন করতে চায়, সবকিছুই লাভ করে অব্যয়ের মাত্রা। সেই ধ্বনিমণ্ডল সত্ত্বেও বাবার অনুপস্থিতিতে তিনি নতুন করে কোলে টেনে নেন সেইসব বইপত্র য়া স্কুলের শেষ পরীক্ষায় বসার জন্য বারংবার ব্যবহৃত হয়েছিল। আরকী আশ্চর্য, তিনি সেবার পাশও করে যান অবলীলায়। তারপর দুবারের চেষ্টায় তিনি পরবর্তী পরীক্ষাতেও সফল হন। নচিকেতা আনন্দদার ঘরে এসে দাঁড়ানোর আগে তিনি স্নাতকও হয়ে গেছেন কালক্রমে, অর্থাৎ তিনবারের চেষ্টায়। সে কালক্রমে আবিষ্কার করে আনন্দদার মধ্যে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ারও বাসনা জেগেছে। যেখানে দূরপাল্লার ট্রেন এসে দাঁড়ায় এবং আবার ফিরে যায় সেখানে যেখান থেকে সে এসেছিল গতকাল, যেখানে মানুষ সংশ্লিষ্ট এবং বিশ্লিষ্ট হয় প্রতি মুহূর্তে ট্রেনের বিভিন্ন আসাযাওয়ার দৌলতে, যেখানে যত ব্যস্ততাততটাই ব্যতিব্যস্ততা জায়মান সর্বক্ষণ, তার খুব কাছেই স্নাতকোত্তর পরীক্ষাপাশের নোট বিক্রি হতে দেখে কিনে ফেলেন আনন্দদা খুব বিশ্বাসের সঙ্গে। ক্রেতার বিশ্বাস যুক্ত হয় সেগুলি বেছে নেওয়া সম্ভব হবে সহজেই---আশ্বাস ও

বিশ্বাসের এটাই ছিল ভিত্তিভূমি। সেই পর্বে রোজ সকালে নচিকেতা আনন্দদার ঘরে ঢুকে দেখতে পেত প্রাচীন ইতিহাসের না না সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর খুব মন দিয়ে সরবে পড়ে চলেছেন তিনি। চা খেতে যাওয়ার আগেই তিনি কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ গুছিয়ে নিতেন। আর সে গর্ভগৃহে ঢুকে যেত প্রাচীন ইতিহাসের সমস্ত কাগজপত্র। অফিসে অবসরকালে তিনি পড়ে নিতে পারবেন এমন এক শুভ ইচ্ছে থেকে তাঁর যাত্রা শু হতো চায়ের দোকানের দিকে। ওই পর্বে আনন্দদা চাইতেন প্রতিদিনের সংলাপ কমিয়ে এনে প্রাচীন ইতিহাসের সংবাদে ফিরে যেতে যতটা সম্ভব। একটার পর একটা বছর চলে যেত। দেখা যেত জয়ের খুব কাছাকাছি এসেও তাঁকে বরণ করেনিতেহচ্ছে পরাজয় ক্রমাগত। শেষে তিনি যখন নতুন বছরের জন্য নতুন করে তৈরি হবেন বলে দূরপাল্লার ট্রেনের খুব কাছের কেন্দ্রর দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন আর স্থির থাকতে পারে না নচিকেতা। সে খাট থেকে উঠে এসে নিরস্ত করে আনন্দদাকে। ---অনেক হয়েছে। আপনি আর এভাবে কষ্ট করবেন না। প্রাচীন ইতিহাসের কতকিছুই তোআপনার জানা হলো। জানার একটা আলাদা আনন্দ আছে। সে আনন্দটুকুই থাকুক। পরীক্ষায় বসে কেন আর কষ্ট করবেন শুধু শুধু। আপনার তো আর ডিগ্রির প্রয়োজন নেই। তার হস্তধারণ এবং উচচারণের মধ্যে এমন একটা বন্ধুত্বনিবিড় হয়ে উঠেছিল যে তাকে সম্মান জানানোটাই ছিল সবচেয়ে বড়ো কাজ সেই মুহূর্তে। আনন্দদা পিছিয়ে এসেতার পাশে বসে তার মুখোমুখি হন। ---সত্যিই আপনি আমার চোখ খুলে দিলেন। এতদিন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম । উপাধির প্রতি আসক্তি যে এই পর্যায়ে চলে গেছে তা আমি টের পাইনি এতদিন। আপনি আমার কত বড়ো উপকার যে করলেন। পিতার সংস্কৃতের উত্তরাধিকার কেন যে তিনি বহন না করে সরেথাকলেন অনেকটা তা এতদিনেওউত্তরাকারে জেনে নেওয়া হয়নি তাঁর কাছ থেকে। তিনি বাংলা হরফ থেকে পাঠ করেন সংস্কৃত স্তোত্র। অনেক মূল কাহিনীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় আছে যথেষ্ট। তাঁর কোনো কোনো উচচারণের মধ্য থেকেও কখনো কখনো যেন বেরিয়েআসতে চায় তৃপ্তিরই স্পন্দন অন্তত কিছুটা। তবু সংস্কৃতের মর্মমূলের কথা ভাবতে গেলে তাঁকে বঙ্গানুবাদের সাহায্যনিতে হয় বারংবার। তাঁর এই পরনির্ভরতা প্রত্যক্ষ করে এবং তাঁর পিতার সেই প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে নচিকেতা টের পায় নদীকে সংগ্রাম করেই খুঁজেনিতে হচ্ছে তার গতিপথ। সেই সংগ্রাম না থাকলে তার বুকপকেটে থাকা দীপদানের মন্ত্রের অনুবাদকর্মের জন্যতাকে এতভাবিত হতে হতো না নিঃসন্দেহে।

পিতার সংস্কৃত না পেলেও আনন্দদা পেয়েছিলেন সেইসব লহমা যেগুলির সাহায্যে এমন কিছু প্রতিভাত হয় যার কোনো বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না কখনো। যে খাটে তিনি বাবার পাশে শুয়ে থাকতেন, এখন বসে থাকতে হয় নচিকেতাকে, যে খাটে তাঁর গুণমুগ্ধ মানুষজন হাওয়ার অভাব স্বীকার করে নিয়েও কিছু পাওয়ার প্রতীক্ষা করে, সেই খাট বা দাক্ষেত্রেই তাঁর সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতার পরিমান খুব কম নয় কিন্তু। তিনি দরজা বন্ধ করে সেই সব উদ্ভাসের কোনো কোনো মুহূর্ত উন্মোচিত করেছেন কোনো কোনো সুযোগে নচিকেতার কাছে। ---আপনি যেখানে এখন বসে আছেন ঠিক সেখানটাতে আমার মাথা ছিল। অনেক রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি মশারির ভেতরটাকেমন এক অদ্ভুত আলোয় ভরে গেছে। পাশে বাবার শায়িত অবয়ব দেখতে পেলাম না। তার বদলে শেষে যা দেখলাম তা দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না আদৌ। বাবা ঠিক খাটে নেই। খাট থেকে কিছুটা ওপরে তিনি বিরাজ করছেন পদ্মাসনে। হ্যাঁ নচিবাবু, গভীর রাতে আমার নিজের চোখে দেখা, এখানে, এই খাটে মাধ্যাকর্ষণের পরাজয়। ঘুমন্তপৃথিবীকে ভেলকি দেখানোর কোনো দায় ছিল না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে না গেলে আমারও দেখতে পাওয়ার কথা নয়। শূন্যে স্থির বাবাকে একটা জ্যোতির বলয়ে মধ্যে দেখে তাঁকে হারানোর কেমন একটা ভয় আমাকে গ্রাস করে ফেলল। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। বাবা বলে ডেকে উঠলাম। তার ফল হলো এই, বাবা হাঠৎ ধপ করে বিছানায় পড়লেন। ঘরে সেই আগের অন্ধকার নেমে এল। একটু ধাতস্থ হয়ে বাবা আমাকে বললেন ---আমাকে ডেকে ভালো কাজ করোনি। যা দেখলে তা তোমার নিজের মধ্যেই রাখো। কাউকে আবার বলতে যেয়ো না। এই রাতের পরে আনন্দদা খুব বেশিদিন তাঁর বাবাকে ধরে রাখতে পারেননি। পিতার সংস্কৃত না পেলেও আনন্দদা পেয়েছিলেন এমন লহমা যখন মনে হয় খাটে শুয়ে শুয়েই যে, গভীরতম দুর্বলতা নেমে এসেছে দেহে। শরীরের তাপ বলে যেন আর কোথাও কিছু অবশিষ্ট নেই। এই সর্বস্বান্ত অবস্থায় তাঁর মনে হয়েছিল তিনি নেই আর কোনোরকম আবদ্ধতার মধ্যে আটকে পড়ে। এই মনে হওয়ার অবস্থা থাকতে থাকতেই তিনি হঠাৎ দেখতে পান অনতিদূরে খাটের ওপর যে মনুষ্যতনু পড়ে আছে সেটা তাঁরই একান্তভাবে। ---পরিস্কার দেখলাম খাটের ওপর পড়ে আছে অনাথবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মজ আনন্দ গঙ্গোপাধ্যায়। তারপর আবার মুহূর্তের মধ্যে কী যে হয়ে গেল, দেখি নিজের মধ্যে ফিরে এসেছি।

নিজেই শুয়ে আছি খাটের ওপর। তবে দুর্বলতা কাটতে একটু সময় লেগেছিল। তা তো হলেই, অত বড়ো দুর্বলতা।
আরো একটা অভিজ্ঞতার কথা জানা আছে নচিকেতার। সে ছাত্রজীবনে স্বকণ্ঠে নিজেকে শোনানোর জন্য কিছু কিছু কবিত
ার কিছু কিছু ভালো লাগা অংশ মুখস্থ করে রেখেছিল। তার অনেকটাই না দেখলেও তাঁর মুখের অনেকটাই সে মনে করে
রেখেছে তাঁর কোনো ছবি দেখে কোনোদিন। সেই আদলের মধ্যে এমন এক হাসির আঁচড় ছিল যা সারল্য ও বত্রতার দা
ম্পত্যেরই শস্য। আপাতত তাকে নাচাতে পারে না আর /অপ্সরাদের নির্মম জলকেলি / সে বুঝেছে বৃথা অজানার অভিস
ার /পাতকের দ্বারা জাতকের ঠেলাঠেলি। আনন্দদার খাটে বসে তাঁর মুখ থেকেও সে যখন জলকেলির সংবাদ পায় তখন
বুঝতে পারে নির্মমতা সরে গিয়ে নিরঞ্জনতার প্রতিষ্ঠা হলো। আনন্দদা যখনকার কথা বলতে চেয়েছিলেন তখন বড়ো নদীর
সঙ্গে ছোটো নদীর কেবল আত্মীয়তা নয়, ছিল সম্পর্কও প্রতিদিন ছিল যাওয়া আসা যাওয়া - আসা, আদানপ্রদান। ধনী
আত্মীয়ের বদান্যতার গরিবের শীর্ণতার মধ্যেও খেলা করত স্ফীতি। ফলে নাব্যতা ছিল এবং তা বুঝতে পেরে বড়ো নৌকে
াও নির্ভয়ে যাতায়াত করত কখনো কখনো। আর ছিল বাড়ি থেকে গামছা হাতে করে বেরিয়ে এসে সামান্য হেঁটে গিয়ে ছে
াটো নদীতে অবগাহন সেরে নেওয়ার বড়ো ধরনের সুযোগ। আনন্দদা ভোরবেলায় উঠে মাঝে মাঝেই সেই সুযোগ কৃতজ্ঞ
চিত্তে গ্রহণ করতেন। এমনই এক গ্রহণপর্বে তিনি ডুব দিয়ে উঠে জলে দাঁড়িয়ে পূর্বাস্য হয়ে স্তবপাঠ করেছেন, হঠাৎ তাঁর চ
ারিদিকে দেখতে পেলেন, সকালের মূলআলোকে ছাপিয়ে যে - আলো প্রকাশ পাচ্ছে, তারই মধ্যে থেকে পরস্পরের দিকে
হাসতে হাসতে যারা জল ছিটিয়ে খেলা করছে তারা যেমন রূপবতী তেমনই গতিশীলা। লহমার মধ্যে তারা মিলিয়ে
গেলেও, অন্য কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যপ্রমাণের অবকাশ না রেখে অন্তর্হিত হলেও তারা যে আসলে পৌরাণিক পটভূমি
থেকে ঝরে পড়া অপ্সরাদেরই সমগ্রোত্রীয় এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত আজও। নচিকেতা তার অর্জিত যুক্তি দিয়ে সেই নৈশিচ
ত্যে কোনো ফাটল সৃষ্টি করার প্রয়াসে যুক্ত থাকতে পারে না একটাই কারণ। এইসব লহমার দু-একটির সঙ্গে সেও যে
জড়িয়ে পড়েছিল পাকেচক্রে। চাকরির চিঠি পেয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যোগ দেওয়ার পর কয়েকদিন কেটে গেছে। কেন্দ্রীয় ক
ার্যালয় থেকে যারা নতুন কাজ পেয়েছে তাদের দু-একদিন করে বিভিন্ন শাখায় শেখানোর জন্য পাঠানো হচ্ছে। ফলে
নচিকেতাকেও তখন ঘুরতে হচ্ছে এক মহাশহরের এক প্রান্তে দু - একদিন পরপর। এভাবে মাসখানেক কাটার পর সে টের
পেল অবিলম্বে কোনো শাখায় স্থায়ীভাবে বলে যাওয়ার নির্দেশ প্রস্তুত করার ভাবনাচিন্তা শু হয়েছে। ফলে সেএকদিন সক
ালের আলোয় আনন্দদার মুখোমুখি হলো। তার দুশ্চিন্তা ছিল যথেষ্ট। তাকে যদি এমন কোনো শাখায়পাঠানো হয় যা
কেবল দূরই নয় দুর্গমও বেশ তবে তার স্বাস্থ্য সেই প্রতিদিনের যাতায়াতের ধকল কতটা সামলাতে পারবে সেই দুশ্চিন্তাই
তাকে মথিত করছিল সর্বক্ষণ। ---এত ভাববেন না। এতে তো শরীর আরো খারাপ হবে। তারচেয়ে আপনি স্নান - খাওয়াদ
াওয়া সেরে নিশ্চিন্তে অফিস চলে যান। আমিও রওনা হই দুগগা করে। আজ রাতের দিকে আপনার এই ব্যাপারটা নিয়ে
আমি একটু বসার চেষ্টা করব। কাল দেখা হবে। পরের দিন সকালে তাকে কাছেবসিয়ে তিনি পদ্মাসনে বসলেন নিজে।
মিনিট খানেকের জন্য চোখ বন্ধ করে থেকে শেষে তিনি তাকালেন তার চোখের দিকে। ---কাল আমি বসেছিলাম। কাল আ
মি দেখেছি। আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, আপনাকে এমন জায়গায় পাঠানো হচ্ছে যেখানে যাওয়া সোজা। আর অফিসটা
গাছ-গাছালি দিয়ে ঘেরা। সামনে কোথাও গাছ-গাছলি দিয়ে ঘেরা আপনাদের কোনো অফিস আছে? মানে আমি কী
বলতে চাইছি জানেন তো, অফিসের সামনে বাগানের মতো কিছু আছে। দেখুন তো কী হয়। গাছ - গাছালির কথা শুনে
ভয় পেয়ে যায় সে। মহাশহরে তাদের কর্মকাণ্ড যেখানে সেখানে সাধারণত চোখে পড়ে যেখানে সেখানে স্থুল বাস্তব। হয় ব
াজার, না হয় ট্রামবাসের ভিড়। হয় মুণ্ডিত মস্তক, না হয় এক জোড়া শিং মস্তকে। শ্যামলিকা কই, কোথায়? শাখা ও শ্য
ামলিমা একাকার যেখানে সেখানে তো শহরেরনির্বাসন। তবে কি তাকে এমন কোথাও পাঠানো হবে যা মূল শহর নয়,
বৃহত্তর শহরের মধ্যে ঢুকে বসে আছে কোথাও?। আনন্দদার আশ্বাস সত্ত্বেও তার দুশ্চিন্তা যেন আরো বেড়ে যেতে থাকে।
কিন্তু যেতে হবে কোথায় সে ব্যাপারে প্রকৃত নির্দেশ এলে সে সত্যিই অবাক হয়। এত শাখা থাকতে তাকে যে শাখায় দেওয়
া হয়েছে সেখানে পৌঁছোতে বাসে বড়োজোর মিনিট পনেরো লাগে এবং বাসও নির্মমভাবে পূর্ণ থাকে না ওঠা বা নামার
সময়। বাস থেকে নেমে কর্মক্ষেত্রের খোঁজ পায় অবিলম্বে। দেখে বাসরাস্তায় পাশেই মূল দরজা। আর মূল দরজা পার
হয়ে অফিসবাড়ি পৌঁছোতে খানিকটা হাঁটতে হয়। কারণ মূল দরজা এবং দোতলা বাড়িটার মাঝখানে একটা বড়ো বাগান
বিরাজমান। সকাল পরিণত হলেও শোনা যাচ্ছিল অচেনা পাখির ডাক। দেখা যাচ্ছিল যাকে সে সবুজের মধ্যে পা ডুবিয়ে

খুরপি হাতে নিয়ে কর্মমগ্ন ছিল। আনন্দদা চোখ বন্ধ করে যা দেখেছিলেন নচিকেতা চোখ খুলে তার চেয়ে ভিন্ন কিছু দেখতে পায়নি সেদিন। এই অভিন্নতার প্রমাণ কারো হাতে যে তুলে দেওয়ার উপায় নেই কোনো তা সে জেনে গেছে নিপায়ভাবে। সুশীলদের লৌহদরজা দিয়ে ঢুকে বাঁদিকে গেলেই যে বারান্দা পড়ে, যে বারান্দা পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, তার অ ায়তনময় ক্ষেত্রে রবিবার কেউ-না-কেউ সারা সকাল বসে থাকতেন হাতের সামনে খুচরোর বাটি রেখে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যারা এসে পথে দাঁড়িয়ে বারান্দার দিকে হাত বাড়িয়ে দিত, তারা ভারতীয় মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হতো না কখনে া। দাতার আসনে পালা করে বসতেন সুশীলের কাকারা। খুব কমই দেখেছে সেখানে শম্ভুনাথকে। কালেভদ্রে দেখা গেছে সুশীলের বাবাকেও। তিনি একটা ইংরেজি খবরের কাগজ হাতে নিয়ে পড়া এবং দান করার কাজ চালিয়ে যেতেন যুগপৎ। কোনো অসুবিধে হতো না। কারণ গ্রহীতার দল কখনোই ছিল না খুব বড়ো। দল বেঁধে যারা আসত তাদের বিদায় করার পর নতুন দল আসতে সময় লাগত কিছুটা। এই অবসরে তিনি ভেতরের পাতায় পৌঁছে গিয়ে প্রথম পৃষ্ঠার উত্তরাধিকার খুঁজে নিতেন স্বচ্ছন্দে। কখনো এমনও হতো, যারা একা একা আসত তাদের দিকে তেমন করে না তাকিয়েই তাদের হাতে মুদ্রা তুলে দিয়ে তিনি তুলে ধরা খবরের স্বাদ নিয়ে নিতেন অবিলম্বে। নচিকেতা অনতিদূরে দাঁড়িয়ে দেখেছে বিজন ব াউলমূর্তি একতারাসমেত। তার কৌটোয় ঝংকার তুলে পড়ছে জমিদারবাড়ির খুচরো পয়সা। এমন সব বিধবারা দল বেঁধে আসত যাদের অবস্থানের মধ্যে তখনো রয়ে গেছে ছলাকলা কিংবা ভ্রুবিলাস। এক অন্ধকে ধরে নিয়ে আসত আর এক অন্ধ। এক হাতে বৃদ্ধকে সামলে আর এক হাত সামনে বাড়িয়ে দিত যে তার মুখে লেগে থাকত কেমন যেন এক ঔদ াস্যের বর্ণ। তার যথেষ্ট যৌবন ছিল এবং সিঁদুরও ছিল পরিমাণে যথেষ্ট। নচিকেতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের মিলিয়ে যাওয়া দেখেছে। কিন্তু দেখতে পায়নি কখনো হাতের শৈথিল্য। ক্ষীণ হতে হতে অনেক বছর আগেই কিছু দিয়ে দেওয়ার এই রবিব াসরীয় ধারা লুপ্ত হয়ে যায়। তারপর থেকেকেউ আর সেই বারান্দার দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে না দিলেও চলে আসে কেউ কেউ কখনো কখনো একেবারে আনন্দদার দরজার সামনে। নচিকেতা তাদের চেনে। একজন গত মাসে হাত পেতে নে াট নিতে নিতে বলেছেন অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে তাঁর মনের কথা। এই পুজোপর্যন্ত কোনোমতে চলে গেলেও আর চলবে ন া তারপরে কোনোমতেই।তখন কিন্তু একটা পরার থান না হলে তাঁর কাছে দাঁড়ানোরই সমস্যা হবে ঠিক। আনন্দদা তাঁকে হতাশ করেননি। --পূজোর তো এখনো দেরি আছে। দেখা যাকনা কী হয়। আশা করি একটা কিছু হয়ে যাবে শেষে। নচিকেতা জানে কী হবে, কী হতে পারে। যারা আনন্দদারআপত্তি না শুনে তাঁকে পুজোর আগে ধুতি দিয়ে চলে যায়, ত াদের কারো কারো ধুতি ঠিক পৌঁছে যাবে ওই ভদ্রমহিলার হাতে। তারা জানতেও পারবে না কখনো। আর যিনি আনন্দদ ার হাত থেকে ধুতি পাবেন, তিনি স্বামীর কাছ থেকে কিছুই পাননি এবং ভাগ্যের কাছ থেকে পেয়েছেন বৈধব্য। তাঁর একম াত্র ছেলে তাঁর হাত ছাড়িয়ে শেষে চলে গেছে তার শাশুড়ির হাত ধরবে বলে। আনন্দদার ধুতি পেয়ে তাঁর হাসিটাইতো হবে কাশফুলের হাসি।

অনতিতণ এক বৈষ্ণবও মাঝে এসে পড়ে। তার মাধ্যমে তাদের মঠের প্রকাশনার কোনো কোনো বইকখনো কখনো কিনে ফেলে নচিকেতার কাছে রাখতে দেন আনন্দদা। আমার ঘরে অবস্থা তো দেখছেন। বই রাখার জায়গা কোথায়? বরং অ াপনার কাছে রেখে দিন। আমার যখন পড়ার ইচ্ছে হবে আপনার কাছ থেকে নিয়ে পড়ব। তেমন ইচ্ছের জন্ম কদচিৎ হয় বলে বেশ মোটা মোটা বইও আনন্দদার বই হয়ে পড়ে থাকে নচিকেতার বইয়ের তাকে। এই বৈষ্ণব তার মঠের সাহায্যের জন্য একটা চাঁদাও নিয়ে যায় মাসে মাসে। সে এতদিন সাদা ধুতিও সাদা জামা পরত। খুব সম্প্রতি তার পোশাকের রঙ পুরোপুরি গেয়া হয়ে গেছে। ---ওর গুদেব ওকে সম্প্রতি সন্ন্যাস দিয়েছেন। এই মঠ থেকেও ওকে চলে যেতে হবে, দুরে কে াথাও। চলে যাওয়ার আগে একবার দেশে গিয়ে স্ত্রী - পুত্রের সঙ্গেদেখা করে আসবে। আমি ওর হাত ধরে বললাম ---যেখ ানেই যান আমাকে কিন্তু ভুলে যাবেন না। আমার কাছে কালেভদ্রে হলেও আসবেন ভাই। আনন্দদার মুখ থেকে নচিকেত ার মাতৃকুলের প্রোজ্জ্বল যে বৈষ্ণব উত্তরাধিকার তার কথা জানতে পেরে একদিন সেই ব্রহ্মচারী একটা কাণ্ড করে বসেছিল। সে নচিকেতার হাত নিজের মাথায় রেখে বারংবার একটা কথাই বলে যাচ্ছিল ---আশীর্বাদ কন যেন আমার গৌরাঙ্গে মতি হয়। শেষে সে নত হয়ে জড়িয়ে ধরে তার পা। ---আমার প্রণাম গ্রহণ কন। আর এই আশীবাদ কন যেনগৌরাঙ্গসুন্দরকে বরণ করে নিতে পারি, জীবনে এবং মরণে. নচিকেতা খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। ভক্তিসাম্রাজ্যের কোনো মানুষ এর আগে এমন করে তাকে সম্মান জানায়নি। সে প্রায় ধরা গলায় বলে ফেলেছিল ---আমার মাতামহবেঁচে থাকলে

আপনার এই আকুলতা দেখে খুব খুশি হতেন। একে মূল্য দেওয়ার যথার্থ শিক্ষা আমার নেই। আমি শুধু শুভকামনা করতে পারি। আপনার শুভ হোক। চায়ের দোকান থেকে ফিরে এসে সেদিনের সেই আকুল মানুষটিকেই সে দেখতে পায়। লোহার দরজা থেকে একটুসরে দাঁড়িয়ে সেই গৌরাঙ্গভক্ত পথের দিকে চেয়ে আছে। আনন্দদা তাকে প্রথমে লক্ষ করেননি। নচিকেতাই তাঁকে এ ব্যাপারে সজাগ করে দিলে তিনি দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে তার কাছে গিয়ে তার পিঠে হাত রাখেন এবং তাকে ঘরমুখো করেন। নচিকেতা এই দুজনকে অনুসরণ করতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়। একবার ভাবে, এখন তো আর ব্যক্তিগত কথা হবে না। ফলে বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভালো একরকম। আর একবার মনে হয় আনন্দদার ঘরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিছুই ঠিক করতে না পেরেশেষে পথের পাশেই পায়চারি করতে থাকে কেবল। হরিজনদের জন্য স ামনেই ছোটো ছোটো ঘর করে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে যাওয়ার দরজা একাধিক। এক দরজারস ামনে থেকে হাঁটা শু করে আর এক দরজার সামনে গিয়ে থেমে যাওয়া মুহূর্তের জন্য। তারপর আবার ফিরে আসা প্রথম দরজার সামনে। চলছিল এভাবেই। হঠাৎ তাঁর ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার নাম ধরে ডেকে ওঠেন আনন্দদা। ফলে অ াস্তে আস্তে নচিকেতা পায়চারি বন্ধ করে তাঁর ঘরের পথ ধরে।

আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? আমাদের তো তেমন কোনো কথা নেই। উনি এই মঠ থেকে অনেক দূরেচলে যাচ্ছেন। আম াদের কাছ থেকে বিদায় নিতে এলেন। ওঁকে বলছিলাম, সবকিছু পারব, কিন্তু বিদায় দিতে পারব না। আমাদের কাছে অ াসতে হবে কিন্তু মাঝে মাঝে। যে অনতিতণ তার মধ্যে আজ কেমন যেন এক শিকড় ছিঁড়ে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার জোর। সে কথায় কথায় হাসছে এবং সে হাসির মধ্যে ফুটে উঠছে গেয়া রঙে অন্যমনস্কতা। সে খুব স্বচ্ছন্দে উঠে যায় একসময়। অ ানন্দদাকে নীরব দেখে একটু আচ্ছন্ন মনে হলো নচিকেতার। সেও কিছুক্ষণ নীরব থাকতে চেষ্টা করে। ভাবতে চেষ্টা করে দেশগাঁয়ের সেই স্ত্রীপুত্রের মুখ বিদায় দেওয়ার সময়। তারপর আস্তে আস্তে পকেট থেকে বের করে সেই কাগজের টুকরো যাতে দীপদানের মন্ত্র লেখা আছে সংস্কৃতে। যোগ্য কেউ অর্থোদ্ধার করবেন আনন্দদার মাধ্যমে---এই আশায় তাঁর হাত তুলে দেয় চিরকুট।

জ ল

বর্ষা নেমে গেছে। তাকে নিয়ে তেমন কোনো চিন্তা নেই আর। এদিকে কিছুদিন আগেই কাগজে দেখেছে হিমালয়ের এক মন্দিরে যাওয়ার জন্য শু হয়ে গেছে যাত্রীদের চলাচল। নচিকেতার জানা একদল তণ যাত্রী হওয়ার অপেক্ষায় যে তৈরি হয়ে আছে সে কথাও তার কানে পৌঁছে গেছে কোনো এক তণেরই দেওয়া পত্রের মাধ্যমে সম্প্রতি। সে কখনো তুষারাবৃত পথঘাট দেখেনি। কীভাবে পাহাড়পর্বত হিমানীয় স্বচ্ছতায় ঢাকা পড়ে, কীভাবে বেরিয়ে আসে মন্ত্রধৌত স্তব্ধতা দিক্‌দিগন্ত থেকে তা তার কাছেই দাঁড়িয়ে থেকে বুঝে নেওয়া হয়ে ওঠেনি আজও। তবেসে ঘরে বসেই টের পায় যারা এগিয়ে যাওয়া শু করে দিয়েছে তাদের সঙঘবদ্ধ শক্তির প্রসন্নতা। প্রসঙ্গত সে এমন কিছু গুহার কথাও জানে যেগুলি আজ আর কালো ক ালো অন্ধকারে ঢাকা নয়। বিজলি বাতির দৌলতে সেগুলির দেওয়ালের গাত্রবর্ণও ধরা পড়ে অনায়াসে। শোনা যায় এমন গুহাও আছে যার একদিনেরপাথর ফাটিয়ে নতুন এক গুহামুখ নির্মাণ করা হয়েছে নতুন দিনের যাত্রীদের কথা মনে রেখে। সে এসব না দেখলেও দেখেছে এমন কিছু পথঘাট যেগুলি একেবারে অন্যরকমভাবে হিমবন্ত। প্রত্যক্ষ করেছে এমন কিছু বা ড়িঘর যেগুলি চাপা পড়ে আছে পাহাড়প্রমাণ নৈঃশব্দ্যের আড়ালে মাসের পর মাস। সে এমন কিছু পরিসরের মধ্যে প্রবেশ করেছে যেগুলির এমন কোনো অংশ নেই যা ভেঙে ফেলে নির্মাণ করা যেতে পারে বেরিয়ে আসার নতুন নতুন পথ। সে সব ক্ষেত্রে নেই এমন কোনো আলোও যার দৌলতে অন্তত নিজেকে দেখে নেওয়া যেতে পারে কোনো এক মুহূর্তে নির্বিবাদে। সে সব ক্ষেত্রে শক্তি সঙঘবদ্ধ নয়, ব্যক্তিগত আপাদমস্তক।

সুধীর গত বছর এমন সময় পৃথিবীতে ছিল। যতদূর মনে করতে পারে নচিকেতা তার মৃত্যুর বাৎসরিক হতে আরো কিছুদিন বাকি। সুধীরের জন্মবর্ষ কত তা নিখুঁতভাবে বলা সম্ভব নয় তার পক্ষে, যদিও প্রায় তিরিশ বছর ধরে সে ছিল তার নিকটতম প্রতিবেশী। তবে তার অনুমান পৃথিবীতে চলে আসার সময়ের দিক থেকে তারসমসাময়িক। বড়োজোর দু-এর বছরের তফাত হতে পারে অঙ্কের হিসেবে। সে যেখানে স্নান করে তার একদিকের দেওয়ালে ওপিঠ যে-ঘেরা জায়গা রান্ন াঘর হিসেবে ব্যবহার করত সুধীর তারই আর এক দেয়াল। ফলে সুধীরযখন সীমাকে সরিয়ে দিয়ে ডাক্তার যা বারণ

করেছে ঠিক তাই রান্না করত তখন সেই রান্নার শিরা - উপশিরার চলাফেরা ঠিক শুনতে পেত নচিকেতা। সীমা কাজের লোক হয়ে এসেছিল সংসারে। তখন সুধীরের সংসারে তার বাবা, মা, ছোটো ভাই ওবোনের উপস্থিতি ছিল। নচিকেতা ত ার বাবাকে প্রথম যখন দেখে তখন তিনি কর্ম থেকে অবসর নিয়েছেন। ভাইরা কেউ কিছুদুর পড়ে পড়া ছেড়ে দিয়েছে, কেউ স্কুলের শেষ পরীক্ষায় ফেল করে আর ওপথে যেতে চায়নি কোনোভাবেই। সুধীররা নচিকেতার প্রতিবেশী হয়ে আসার অ াগে যেখানে থাকত সেখানেএকটাই উঠোন, কিন্তু পরিবার বেশ কয়েকটা। এই উঠোনের দরজা দিয়ে পথে চলে এলে অ ানন্দদার ঘরে পৌঁছাতে কারো বেশি সময় লাগবে না। ঠিক কোন উঠোনের সামনের কোন ঘরে তারা বাস করত এর অ াগে তা জানা না থাকলেও জায়গাটা জানা থাকায় নচিকেতার দূরত্বগত হিসেব করতে খুব কম সময় লেগেছে। কোনো দিনও সে সুধীরকে জিজ্ঞেস করে উঠতে পারেনি সে আনন্দদাকে চেনে কিনা। চা খেয়ে ফিরে এসে বাড়ির গলিতে কখনো ত ারসঙ্গে দেখা হলে কোনো বিষয় নিয়েই কোনো প্র করতে উৎসাহ জাগেনি তেমন। সুধীরের বাবা,মা, ভাইরা এবংবোন অন্তত বছর দশেক নচিকেতার নিকটতম প্রতিবেশী থেকে তাদের নতুন বাড়িতে চলে যায়। দুটোঘরের মধ্যে এত মানুষ ছিল কী করে, তারা চলে যাওয়ার পর এই প্রশ্নের রচয়িতা হয়ে সে আপনমনে উত্তর খুঁজেছে নানা দিক থেকে। সমাজ তথা অর্থনীতির অনেকরকম জ্ঞানের সাহায্য নিয়েও মাঝে মাঝে বিমূঢ় হতে হয়েছেতাকে। বোন দ্রুতগতিতে বড় হচ্ছিল, সুধীরের সহোদরের মোট সংখ্যা পাঁচ এবং সীমাও আস্তেআস্তে হয়ে উঠেছিল রাতদিনের কর্মী। এমন ঘনবসতি যখন মনে হচ্ছিল চিরকালীন ঠিক তখনই অনেকদিন আগে কিনে রাখা জমির ওপর ঘর তুলে বেশ বড়ো ঝুঁকি নিয়ে সবাইকে সঙ্গে করে স্থানত্যাগ করেন বাবা। কেবল পড়ে থাকে দুজন, সুধীর ওসীমা পুরোনো সংসারের পুরোপুরি। ফলে প্রায় কুড়ি বছর ধরে ঘর ও মানুষের সংখ্যা মিলে গিয়েছিল।

সুধীর অল্প পড়াশোনা করে চাকরি করেছে অল্প বয়স থেকে। নচিকেতা যখন স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে বিরাজমান তখনই দেখেছে টাই পরে হাতে ঝলমলে আধার ঝুলিয়ে তাকে বেরিয়ে যেতে রোজ। পুজোর সময় সে বাবা-মা-ভাই-বোন ও সীম াকে প্রাণ ভরে উপহার দিত। জমাদার আর গম্ভীর ধোপানিও তার উপহার পেয়ে গলিতে বা নীল আকাশের তলায় দাঁ ড়িয়ে কীভাবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠতে পারে তা লক্ষ করেছে নচিকেতা কয়েকবার। সুধীর একসময় এমন সংস্থায় কাজ করত যার বাজার দেশে দেশে। সেই সংস্থার পাউডারের কৌটো তাকেও উপহার দিয়েছে সে। ---আরে মশ াই, এত দ্বিধা কেন? চোরাই মাল নয়, নিন, ধন আমি তো আপনাকে উপহার দিচ্ছি। দোকানদারের উপহার নিতে প ারেন, আর বন্ধুর উপহার নেবেন না কেন? খুব দ্বিধার সঙ্গে নচিকেতা জানিয়েছে-- কী করব পাউডার নিয়ে? আমি নিজে তো তেমন ব্যবহার করি না। করি কদাচিৎ। সুধীর খুব জোর দিয়ে বলে উঠেছিল---কোনো সমস্যা নয়। আপনার বাড়িতে তো ক্যারাম বোর্ড আছে। ওই খাতে এই পাউডার খরচ করবেন। তবে সুধীর কিন্তু কখনো তাদের ঘরে প্রবেশ করে বলেনি--- আসুন, একটা গেম হয়ে থাক। অস্বীকার করে লাভ নেই, সুধীরের দেওয়া পাউডার বহুবারই ব্যবহার করা হয়েছে সেই কাঠের আয়তনে। বহুবারই ঘুঁটি সাজানোর পরে এবং সেই সংহত রূপ নষ্ট করার আগে সেই বহুজাতিক সংস্থার সাদা সাদা গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়েছে সবদিকের পরিণতির সবরকম সম্ভাবনার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ পিচ্ছিলতা এনে দেওয়ার জন্য। ক্ষেত্র পিছল হয়ে পড়ার ফলে আঘাতের মধ্যে এসে পড়েছে মাত্রাপতন। যত পতন ততই যে লক্ষ্যচ্যুতি, ততই যে দূরে সরে যাওয়া সাফল্য থেকে, এই ব্যবহারিক জ্ঞান প্রকট হয়ে উঠেছে ক্রমশ। সুধীর বেশ কিছুদিন ওই সংস্থার কাজ করেছিল। ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পর সে এক এক করে অনেক জায়গাতেই যোগ দিয়েছ। ওইসব জায়গায় তার যত দাপট ছিল ততটা অর্থ ছিল না। এই দাপট কাজে লাগিয়ে সে কোনো কোনো সংসারের কোনো কোনে া বেকারকে যে দারিদ্র্যদহন থেকে সরিয়ে আনতে পেরেছে এ খবর শুধু নচিকেতা নয় পাড়ার অনেকেরই জানা। সেইসব যুবকদের কারো কারো মুখমণ্ডলে জীবনের সঞ্চার স্বচক্ষে দেখেছে নচিকেতা। বলে রাখা ভালো যে, সুধীরের শেষ দিকট াতে তারা কেউই তার ধারেকাছে আসেনি এক মুহূর্তের জন্যও। বলে রাখা ভালো যে, এইসব ছেলেরা তাকে যেমন সুধীরদা বলেছে তেমন সীমাকে বেশ পরিষ্কার করে বলে এসেছে কাকিমা। গ্ণ এবং শীর্ণ সীমা সুধীরের কাছে কেউ এলে কোনো প্রতিবাদ না করে তাদের খিদে পাওয়ার কথা শুনে জলখাবারের দাবি মিটিয়েছে সময়ে-অসময়ে। দেয়ালের এপার থেকে তাদের রঙিন গুঞ্জনের শব্দ শুনতে কোনোদিনও কষ্ট হয়নি তেমন। নচিকেতা এও স্বীকার করে যে, শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সুধীর আমৃত্যু অচ্যুত ছিল তার মদ্যাসক্তি ও অপভাষা প্রয়োগের সামর্থ্য থেকে। সামর্থ্য নয় বলে ব্রত এই শব্দটিকে

আনার লোভ সে ছাড়তে পারেনি আজও। সুধীর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সূর্য অস্ত গেলে তার বাইরের সঙ্গীদের নিয়ে গোল হয়ে বসত এবং বন্ধ করে দিত বাইরের ঘরের দরজা। সীমা তার মনিবের শিক্ষা কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই ত াদের সামনে সাজিয়ে দিত উপকরণ। শু হতো একটু একটু করে ডুবে মগ্ন হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া। দেখা যেত ব্রত চলাকালীন আসন ত্যাগের প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। দেখা যেত ব্রত সমানপনান্তে সুধীর ছাড়া আর কেউ নেই আসনে এবং তার মুখ দিয়ে অনর্গল এমন সব ভাষা বেরিয়ে আসছে যা বিশেষকরে মগ্নতা ছাড়া একজন নারীর উদ্দেশে এত অবলীলায় উচচারিত হতে পারে না। নচিকেতা বাইরে থেকেই বুঝতে পারত সীমার প্রতি ধাবিত এইসব বর্ণমালা বিফল হয়ে যেতে বসেছে তার অবিচলিত থাকার ব্যাপকতায়। মাঝে মাঝে সীমা যে জন্মভূমি ছেড়ে এসেছে তারই টান কথনের মধ্যে এনে বলে উঠত খুব স্বাভাবিকভাবে--- আমি তো আপনার কাছেই আছি। এমনটা করলে আরো যে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। তখন কী হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে এক পুষ এক নারীকে ভাষা দিয়েই নগ্ন করে ভাষা দিয়েই সেরে নিত নৈশকর্ম। সব ঘরে বসেই কানে আসত নচিকেতার। ইচ্ছে হতো এক-একবার দৌড়ে গিয়ে তাদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ার। কিন্তু সাহস পেত না ঠিক। হয়তো এতে হিতে বিপরীতও হতে পারে এমনও ভাবত সে। কারণ সীমার মধ্যে কখনো কখনো লাঞ্ছনার মাধ্যমে তৃপ্তি খুঁজে নেওয় ার প্রবণতা দেখা যেত বেশ। মাঝে মাঝে সীমার ছেলে বা মেয়ে তাদের মাতৃহীন সংসার থেকে বেরিয়ে হেঁটে চলে আসত ত াদের মায়ের কাছে । গলির মুখে নচিকেতার জানলার সামনে তারা চাপা গলায় কথা বলত সংসার নিয়ে। সেই আলোচন ার মধ্য থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসত সীমার স্বামীর কর্মব্যস্ত মুখ, সীমার শাশুড়ির গৃহকর্মের মুখোশ। আর উঠে আসত সুধীরের পৌষ, তার দয়াধর্ম, তার সীমার প্রতি বৈষয়িক বিশ্বাস। ছেলে বা মেয়েকে এক - একটা বিচ্ছিন্ন প্রস্থানপর্বের একেব ারে শেষে সে বলে উঠতে শুনেছে--- মা, একদিন যেয়ো না গো। এই আবেদন কোনোদিন ফিকে হয়নি তেমন। আবেদনের উত্তর কী যে বলত সীমা তা আর শোনা সম্ভব হয়নি কোনোদিনও নচিকেতার পক্ষে। তার কারণ আবেদনের ধ্বনিকে ছড়িয়ে পড়তে না দিয়ে এক মা তার ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে এগোতে শু করত সামনের দিকে। যে চলমান তার ভাষাও চলতে শু করে বলে নচিকেতার কানে কিছুই এসে পৌঁছোয়নি। নেশায় নীল হয়ে সুধীর হতে পারত আরম্ভ এবং সেই সুব াদে সে মাঝে মাঝে ঘর থেকে বের করে দিত সীমাকে। থই থই রজনীতে সীমা বিতাড়িত হলে সে সারারাত ধরে বাড়ির গলিতে ঘুরে বেড়াতে। এমনকী নচিকেতা কোনো বন্ধুর দাহ শেষ করে মাঝরাতে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখেছে সুধীরের দ্ধ জান ালার নীচে বিড়ি ধরিয়ে গুটিসুটি হয়ে পড়ে থাকতে সীমাকে। যেসব বিতাড়নের মেয়াদ ঠিক ভোরবেলায় ফুরিয়ে যেত সেগুলির মুখোমুখি হতে বিশেষ বেগ পেতে হতো না তাকে। কারণ সুধীরের চারিদিক পরিত্রমা করে বা অবস্থান বজায় রেখে কয়েক ঘন্টার রাত কাটিয়ে দেওয়াটা শীতের রাত্তিরেও তার পক্ষে তেমন বেদনাদায়ক হতে পারেনি। কিন্তু বিত াড়নের আয়ু যখন কয়েক ঘন্টার থেকে বেড়ে শেষে কয়েকদিন গিয়ে দাঁড়াতো তখন তো আর সীমাকে চোখের সামনে প াওয়া যেত না দাঁড়ানো বা বসা অবস্থায়। তখন তাকে ছেড়ে যেতে হতো সেই প্রতিষ্ঠাভূমি। কিন্তু সে কোথায় যেত, কীভাবে কাটাত দিন তা কোনোদিনও জেনে ওঠা হয়নি নচিকেতার পক্ষে। একথাও সে ভাবতে চেয়েছে যে, সীমার আত্মজ বা অ াত্মজা যে আমন্ত্রণেব নবীকরণে ব্যস্ত থেকেছে চিরকাল, তার সঙ্গে কোথাও কোনো স্পর্শবিন্দু রচিত হয়েছে কিনা এই স াময়িকভাবে চলে যাওয়ার অধ্যায়গুলোতে। নচিকেতার পক্ষে কোনোদিনও সম্ভম ছিল না সুদীরের মুখোমুখি হয়ে শেষে সীমার সম্পর্কে মুখর হয়ে ওঠা কোনো এক বাঁকে পৌঁছে অকস্মাৎ।

মাঝে মাঝে তার চাকরির চাপে সুধীরকে ছড়িয়ে পড়তে হতো বেশ কিছুদিনের জন্য প্রদেশ থেকে প্রদেশে। তখন কিন্তু সীম ার মুখোমুখির হয়ে অনায়াসেই জেনে নেওয়া যেত সুধীরের বিরাজমানতা কোনদিকে, কোনদিকে তার ভাবী সম্প্রসারণ, এমনকী তার প্রত্যবর্তনের সম্ভাব্য দিনক্ষণ। নচিকেতার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়েসীমার মুখে বড়দা এই শব্দটি উচচারিত হতো বারংবার। ---বড়দা এবার করে ফিরবেন বড়দা নিজেই জানেন না। কাল ফোন করে বললেন কাজের খুব চাপ। আর ওখানে নাকি বৃষ্টিও হচ্ছে খুব। আর পাহাড়ি জায়গায় অত বৃষ্টি হলে বড়দার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হবে কী করে। শরীরও তো ভালো না। তাছাড়া ঠাণ্ডার ধাত আছে বড়দার জানেন তো আপনি। নচিকেতা একবার বহির্মুখী সুধীরের হ াতে বিশুদ্ধ সোয়েটার কেনার অর্থ প্রদান করেছিল খুব অন্তর্মুখী হয়ে। অর্থপ্রদানের মুহূর্তে তার বাবার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল যিনি সারাজীবন অতিবাহিত করেছেন এমন সব শীতবস্ত্র পরেযেগুলির মধ্যে তেমন কোনো যিনি সারাজীবন অতিবাহিত করেছেন এমন সব শীতবস্ত্র পরে যেগুলির মধ্যে তেমন কোনো উষ্ণতার বলয় ছিল না কোনোদিনও। সুধীর ত

ার অন্যমনস্কতা লক্ষ করে বলে উঠেছিল---আপনি কী ভাবছেন? এমন সোয়েটার আনব যা পরে আপনি ঘেমে উঠবেন এখানে। এখানে আর ঠাণ্ডা কদিন থাকে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সীমা চুপ করে থাকতে পারেনি। ---বড়দা যেখানে যাচ্ছেন সেখানেনাকি বরফ পড়ে। পথঘাট বরফে ঢেকে যায়। আমি এক-এক সময় বসে বসে ভাবি, এখানে বরফ পড়লে আমাদের অবস্থা কী হতো।

সুধীর যখন ঘরে থাকত না, থাকত সমুদ্রতীরে বা শৈলশহরে, কিংবা এমন সব জায়গায় যেখানে একদিন নানক এসেছিলেন, কিংবা এসেছিলেন মীরাবাঈ, থাকত এমন সব বিস্তৃত ভাবমণ্ডলের কাছে যেখানে ব্যক্তিকেঘিরে উঠেছে অথবা ব্যক্তির বিশ্লেষণ থেকে দানা বেঁধেছে অস্তিত্বের সংশ্লেষ ক্রমে ক্রমে, জয়ধবনি উঠেছে মহাজীবনের, মৃত্যুকে একেবারে আনন্দময় স্তর থেকে সনাক্ত করা হয়েছে বারংবার, তখন ঘরে বিরাজ করত সীমা একেবারে নিবিড়তম হয়ে। উনুনে রান্না চাপিয়ে অ াগুনের খুব কাছে বসে সে সুর আনত গলায় তার সঙ্গে কেমন এক কান্না মিশে থাকত সারাক্ষণ। নচিকেতা দেখেছে, যা কিছু মূলকে ছুঁয়ে আছে সবই কোথাও - না - কোথাও ছুঁয়ে আছে সেই কান্নাকে নিশ্চিত। সীমার সঙ্গে কোনোদিন গ্রন্থগত আলোচনার কোনো সুযোগ ছিল না। তবু সে বুঝতে পারত, সন্ধের পরে যে রমণী উনুনে রান্না চাপিয়ে গলায় বসিয়েছে সুর, সে কিন্তু অনায়াসেই ঘাটে নৌকো বেঁধে লণ্ঠনের আলোয় অবস্থান করেও ছুঁতে চাইছে নিজেরই অজান্তে মর্মমূল ডুব দিয়ে দিয়ে। এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, সুধীরের অনুপস্থিতিতে সীমাকে চেনা যেত না কোনো প্রতিষ্ঠিত সূত্র দিয়ে। কেবলই মনে হতো নতুন সূত্রের প্রতিষ্ঠা হোক।

মাঝে মাঝে তার ভূমিকায় নামতে না দিয়ে সধীর নিজে নেমে পড়ত হঠাৎ। সীমা শুধু আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেত। আগুন ভালোভাবে জ্বলে উঠলে সে পাশে দাঁড়িয়ে থাকত এবং রাঁধুনির ভূমিকায় নামত সুধীর। সীমার গলা শোনা যেত সে রান্না থেকে সরে থাকলেও। সে নীরবে পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে সধীরের পক্ষে যে লক্ষ্যে পৌঁছোনো সম্ভব হতো না কখনো তা নিকটতম প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে বুঝতে পেরেছে নচিকেতা বারংবার। যথাসময়ে সুধীর জেনে যেত কোথায় কতটা মশলা দিতে হবে, আগুনের সংস্পর্শে রাখতে হবে কোনটাকে কতক্ষণ। অনেকসময় এমনও হয়েছে পরিচালিত সুধীর রান্না করতে করতে উঠে গেছে কোনো বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে। তখন অসম্পূর্ণ যা তাকে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব এসে পড়েছে সীমার ওপর। সীমা সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে উনুনের সামনেবসে পূর্বসূরির অনভিজ্ঞতার ফলে ঘটে যাওয়া দোষগুলোকে নিয়ে এতটাই সরব হয়েছে যে সুধীরকে ফিরে আসতে হয়েছে আগুনের কাছে অবিলম্বে। ---এখন অ ার এসে দাঁড়ালে কী হবে? আপনি আমার একটা কথা শোনেন? যা করে রেখে গেছেন তার পরে আর কিছু করা যায়। পনিরের কত দাম। এ একটা কী পদার্থ হয়েছে বলুন তো ? এর আর আমি কী গতি করব? সীমার গলায় হতাশার সুর নির্ভেজাল। আর সুধীরের গলায় অপরাধীর নম্রতা। --যা হবারতা হয়ে গেছে। তুমি ইচ্ছে করলে ঠিক একটা কিছু করে উঠতে পারবে। তুমি কি যে সে রাধুনি। ---থাক আমাকে আর মাথায় তুলতে হবে না। একটুখানি পায়ে রাখবেন। তাতেই হবে। এখন আপনি এখান থেকে সরেন তো। আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে।

সত্যিই মাথা গরম হয়ে যেত সীমার এক-একটা নিবিড় নিশীথের বঞ্চনার কথা ভেবে। সে তার রাগ প্রকাশও করে ফেলত দিবালোকে এতটাই জোরের সঙ্গে যে, শুনতে পেয়ে যেত নচিকেতা অনতিদূরে সংবাদপত্র পড়তে পড়তে। অমুদ্রিত এবং ভেসে আসা এই সংবাদের মধ্যে অরন্ধনের লক্ষণ ছিল পূর্ণমাত্রায়। নচিকেতা সেইসব অদগ্ধ উচচারণ থেকে বের করে অ ানতে পারত এমন এক কাহিনী যা ঘটে এসেছে চিরকাল নব নব ক্ষেত্রে, নব নব বর্ষায় বারংবার। যে ধোপানিকে সুধীর বিদ ায় করত না তার শত গাফিলতি সত্ত্বেও, উপরন্তু পারিতোষিক দিত শরৎকালে প্রাণখুলে, সেই ধোপানির হাতে যা যা বস্ত্র তুলে দেওয়ার সে সব ন্যস্ত করে একে একে তাকে কিছুদূর অনুসরণ করত সীমা। কারণ ঘরে নয়, ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে তার কিছু বলার ছিল তাকে। সীমা ভেতরের ঘরে মেঝেতে শুয়ে মাঝরাতে ঠিক শুনতে পেয়েছে সেই শব্দ যা বাইরের ঘরের দরজায় রচিত হয়ে থাকে মাঝে মাঝে। সেই সংকেত পাওয়ার পর বাইরের ঘরের দরজা খুলে দিয়ে যে বাইরে দাঁ ড়িয়ে আছে তাকে ভেতরে বরণ করে নেওয়া হয় প্রায় নিঃশব্দে। দুই ঘরের মাঝখানের যে দরজা তা কেবল বাইরের ঘর থেকেই বন্ধ করা সম্ভব। তার খিল সেদিন আর সারা রাতে খোলার প্রয়োজন হয় না কখনো। সেদিন সারারাত ভেতরের ঘরে বন্দী থাকতে হয় সীমাকে। কারণ বাইরের ঘরে ভোর পর্যন্ত চলে সুদীর ও ধোপানির বাধাবন্ধনহীন কর্মকাণ্ড। এখনো ক ানে বাজে সীমার হাহাকার। ---আমাকেছিবড়ে করে তোর দিকে হাত বাড়িয়েছে। তোকে সাবধান করে দিচ্ছি। কথা না

শুনলে আমি কিন্তু তোকে চিবিয়ে খাব। মনে থাকে যেন। কে কাকে চিবিয়ে খায়? কিছুই বুঝতে পারে না নচিকেতা। আজ সকালে টি কিনতে গিয়ে সেধোপানির মুখে আবিষ্কার করেছে নবতম ধোপা মিলে যাওয়ার হাসি। অথচ সুধীর বা সীমার হ াসি আজ সকালের কোনো স্তরেই যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না, এর চেয়ে বড়ো সত্য আর কী আছে।

বুকে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে কোনো এক বছরের কোনো এক দিনে যখন প্রবলভাবে ঘামতে শু করেছিল সুধীর তখন তার সক ালবেলার ঘরে সীমা ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব ছিল না ঠিক সেই মুহূর্তে। সীমা তার শীর্ণতা সত্ত্বেও বিহ্বল হয়নি। বরং ঠ াণ্ডা মাথায় ফোন করে খবর দিয়েছে এমন দু-একজনকে যারা যথাসময়ে এসে পড়লে ভিড় বাড়ে না, কিন্তু ধীরভাবে কর্তব্য সাধিত হয়। যথাসময়ে যারা এসে পড়ে তারা অচিরাৎ ট্যাক্সি ধরে রোগীকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যায় তখন কারো ব ারণ না শুনে, কর্ণপাত না করে কারো কথায় ঘর দ্ধ করে তালা ঝুলিয়ে সহযাত্রী হয় সীমা। যখন হাসপাতালের তরফ থেকে রোগীর বাড়ির কাউকে কয়েকরাত হাসপাতালে কাটানোর কথাটা পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয় তখন কিঞ্চিৎ কুঁজো হয়েও যাকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় সেই দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে বহুবার দেখা যায়নি স্বামী, পুত্র, কন্যা এবং শাশুড়িশোভিত সেই সংসারে রাত কাটাতে কোনোদিন। সীমার সেই হাসপাতালবাসের পর্বে সকালবেলার খবর কাগজ পড়ে থাকত দ্ধ দরজার ঠিক নীচে ম্লান হয়ে। নচিকেতা তা তুলে এনে তার কাছে রেখে দিতে গিয়ে টের পেয়েছে সুধীরের পড়াশোনা প্রাথমিক স্তরে থেকে গেলেও খবরের কাগজ পড়ার ক্ষেত্রে সে আঞ্চলিক পত্রিকায় থেমে না থেকে হাত বা ড়িয়েছে এমন কাগজের দিকে যা যেমন ভারী তেমনই সর্বভারতীয়। সেই পত্রিকার অনেক পাতার ভিড়ে চাপা পড়া ইভার জরায়ুর টিউমার নিয়ে যে লেখা তা দেবীপক্ষে খুঁজে বের করে সে যে শেষে পড়তে পেরেছিল তার জন্য কিন্তু দায়ি ছিল সুধীরই প্রকারান্তরে। কিন্তু সুধীরের সেই সংকটাবস্থায় এত মানুষের ভিড়ে চাপা পড়া সীমাকে খুঁজে বের করে পাঠ করার সুযোগ না পাওয়ার জন্য নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই দায়ি করতে পারে না নচিকেতা কোনোভাবেই। সীমা যেখানে বাজ ার করতে যেত সেখানে যেতে গেলে ইভাদের লোহার দরজা বাঁদিকে রেখে এগিয়ে যেতে হতো বেশ খানিকটা। সুধীর তার হাতে টাকা দিত, দিত তালিকা কী কী আনতে হবে তার। হাতে থলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ার আগে কতবার যে বানান করে করে পড়ে নিত মাছের নাম, শাকের নাম, বিস্কুটের নাম এমনকী। নচিকেতার শুনতে শুনতে মনে স্বস্তি জেগেছে সর্বদা। যে ন ারী সাক্ষর, যে নারী নাম এমনকী। নচিকেতার শুনতে শুনতে মনে স্বস্তি জেগেছে সর্বদা। যে নারী সাক্ষর, যে নারী চিরকুট থেকে পড়ে নিতে পারে শাকের আঞ্চলিক নাম থেকে বিস্কুটের আন্তর্জাতিক নাম, তার পাঠোদ্ধারে যত সময়ই লাগুক ত াতে কোনো ক্ষতি নেই। সে একসময় ঠিকই বেরিয়ে পড়তে সক্ষম হবে এবং বাজারে পৌঁছে হিসেব করে সদ্ব্যবহার করতে পারবে টাকার। বাজার থেকে ফিরতে সময় লাগত তার । কিন্তু ফিরত যখন তখন সুধীরকে এমন কিছু বলার সুযোগ দিত না যা ত্রোধসঞ্জাত। সুধীর তালিকা মিলিয়ে জিনিস ও অর্থের হিসেব করতে করতে কতবার যে সজোরে বলে উঠেছে--- ভেরি গুড। সীমা খুশি থাকতে থাকতেই তাকে সাবধান করে দিত, সে যেন খুব বেশি প্রশংসা না করে। তার কারণ এই প্রশংসারাশির আয়ু বড়ো কম। পরবর্তী প্রহরেই যে কান কথা শুনে আনন্দ পেয়েছে সেই কানেই আঙুল দিতে হতে পারে কথা না শোনার সর্বাত্মক চেষ্টায়। আর সুধীরের সেইসব কথার মধ্যে থাকতে পারে এমন সব দৃশ্য যা দেহের বাজার থেকেই উঠে আসত মূলত। সীমার এই পরিণতিবোধ, কিংবা এই সীমান্তচেতনা, অস্বীকার করে লাভ নেই নচিকেতাকে ভা বিয়েছে কখনো-না-কখনো। নচিকেতা এও মনে রেখেছে, যে- বাজারে সুধীরের তালিকা হাতে সীমার ঘোরাফেরা সপ্তাহে দুদিন অন্তত, জনশ্রুতি এই যে সেই বাজারের খুব কাছেই থাকে তার স্বামী, পুত্র, কন্যা এবং শাশুড়ি। যেতে আসতে পথে কখনো কি সে স্বামীর চোখের সামনে পড়ে গিয়েছিল? ইভা কোনোদিন তেমন তেমন কোনো সাক্ষাৎকারের রঙ নিয়ে কে ানো রবিবারের পাতা রাঙাতে পারবে কিনা তা আজও জানে না নচিকেতা নিশ্চিত।

সেই অসুস্থতা সামলে নিয়ে সুধীর আরো বছরদেড়েক এই পৃথিবীতে ছিল। এই আঠারো মাসের মধ্যে সে কয়েকবার সীম ার ওপর চাপিয়েছিল বহিষ্করণের নির্দেশ। এইসব বহিষ্করণের মধ্যে একটি ছাড়া আর সবকটারই আয়ু ছ-সাত ঘন্টা করে। অর্থাৎ রাত বারোটায় নেশায় তলিয়ে গিয়ে সীমাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়েছে এবং সকাল ছটা কি সাতটায় স ারারাত গলিতে থাকা সীমা ঘরে ঢোকার চেষ্টা করলে তাতে কোনোরকম বাধা দেওয়া হয়নি। একটিমাত্র বহিষ্করণ আয়ুষ্ম ান হয়ে যে বহিষ্কার করে তারই আয়ু হরণ করে অবশেষে। অর্থাৎ একবার সীমাকে সন্ধেরাতে কেবল বেরিয়ে যেতেই বলা হলো না, সে বেরোনোমাত্র তার পেছন - পেছন বেশ খানিকটা গিয়ে তাকেপথে নামিয়ে জানিয়ে দেওয়া হলো, সে যদি

ফের আসে, যদি ফের এমুখো হয় তবে তাকে দূর করে দেওয়া হবে পদাঘাতে। সেই নির্দেশের পর থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে থাকে সীমা বেশ কিছুকাল। শুধু দু-একবার আঞ্চলিক পথের কোনো এক দিক থেকে সে এগিয়ে এসে হঠাৎ মুখোমুখি হয়েছে নচিকেতার। --আপনাকে দেখে একটা কথা জানতে এলাম। কেমন আছেন বড়দা? সে হয়তো উত্তর দিয়েছে একটু ঘুরিয়ে। ---যেমন থাকার কথা ঠিক তেমনই আছেন। তাতে আরো অপ্রতিভ হয়ে আরো এগিয়ে এসে অপলক চোখের সাহায্যে প্রাকে করা হয়েছে আরো প্রত্যক্ষ। ---ছাইপাঁশ গিলছেন না গিলছেন না? ফলে উত্তরদাতাকেও হতে হয়েছে কেন্দ্রমুখী। ---গিলছেন না আবার, দিনে রাতে গিলছেন। এই কথা শুনে সীমা কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে পথিকের ভিড়ে নিজেকে মিশিয়ে দেয় আস্তে আস্তে।

এবেবারে শেষ দিকটাতে সুধীরের পক্ষে কারণে অকারণে মানুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণীকে গালাগালি দেওয়া ছাড় আর তেমন কিছুই করা সম্ভব ছিল না বলে সে মাঝে মাঝে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পথের পাশের চায়ের দোকানের বেঞ্চের ওপর বসে থাকত দ্রুতবিলীয়মান পুঁজির ওপর নির্ভর করে মূলত। দামি জামাকাপড় আর সুট-বুটপরাসুধীরের যে সপ্রতিভ মূর্তিটাকে একদিন ঘুরে বেড়াতে দেখাযেত দেশ দেশান্তরে তার বদলে এই মূর্তিটাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে শেষ দিকে । কতবার ঘরে ফিরতে গিয়ে নচিকেতা দেখেছে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একজন লুঙির খুঁটি দিয়ে সকলের অজান্তে চোখ মুছে নিচ্ছে হঠাৎ। যেদিন সে সত্যিই চলে গেল তার ঠিক দুসপ্তাহ আগে থেকেই থেকে থেকে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসত কাতরানির এমন এক আওয়াজ যা শুনতে শুনতে নচিকেতার মনে হতো, এক অত্যন্ত অসম প্রতিযোগিতার ফল ঘোষিত হতে চলেছে কোথাও। একদিন দুপুরের ভাতের থালা সামনে রেখে মাছের মাথা খাওয়ার পরিশ্রম স্বীকার করতে গিয়ে তার মনে হলো তার নিকটতম প্রতিবেশী হালের ওষুধের কল্যাণে বোধহয় সামলে নিতে পেরেছে ধবনির সেই সাময়িক বিকৃতি। ঘন্টাখানেক আগেও গলিতে যাকে ধীরে ধীরে পথ থেকে ফিরে আসতে দেখা গেছে সে দুর্বল হলেও ছিল নিঃশব্দ। মাছের মাথা মুখে তোলার সময়েও সেই নৈঃশব্দ্যের কোনো হানি হয়নি দেখে নচিকেতা স্বস্তি পেয়েছিল কিঞ্চিৎ। এ কথাও ভাবতে শু করেছিল যে, বিকেলের দিকে নিকটতম প্রতিবেশীর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে গালাগাল শোনার ঝুঁকি নিয়েও জিজ্ঞেস করবে---সীমার কোনো ঠিকানা জানেন? যদি জানা থাকে আমাকে বলুন। আমি ঠিক ওকে খুঁজে বের করব। তার ভাবনায় ছেদ পড়ে হঠাৎ। কারণ গলির দিকে খোলা জানালার শিক ধরে উঠতে দাঁড়িয়ে মানুষ চেয়েছিল মানুষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হঠাৎ। যে চায়ের দোকানের সামনে দিনের বিভিন্ন সময়ে সুধীরকে বসে থাকতে দেখা যেত সেই দোকানের মালিকের উচচরব। ---নচিদা, একটু আসবেন সুধীরদার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আমি এখন চা-টী দিতে গিয়ে দেখলাম, ঘর খোলা। সুদীরদা খাটে শুয়ে আছে। কিন্তু সাড়াশব্দ নেই। আমার ভয় করছে। আপনি একটু আসবেন? এক ঘর ছেড়ে আর এক ঘরে যাওয়ার এই ডাক যেমন শুনতে পায় তেমন এও শ্রবন করে নচিকেতা যে চায়েরদোকানে বসে বসে সুধীর মালিককে শুনিয়েছিল তার সিদ্ধান্তের কথা। যেহেতু যন্ত্রণা তথাশ্বাসকষ্ট এত ওষুধ সত্ত্বেও অসহ্য হয়ে উঠছে ক্রমে ক্রমে, তাই সে আর অপেক্ষা করতে চায় না। যে ঘুমের ওষুধ সে রোজ ব্যবহার করে তারই অকৃত্রিম আর বিপুল সহযোগিতায় সে এবার এমন জায়গায় পালাবে যেখানে না আছে যন্ত্রণা, না আছে শ্বাসকষ্ট। দোকানের মালিক জগতের মালিককে স্মরণ করতে করতে তাকে সামনে রাখতে চেয়েছিল।

কৃষ্ণের প্রতি যশোদার একটা উক্তির ভাষা বহুদিন আগে অনুবাদের ভাষা থেকে আঁচ করে নিতে পেয়েছিল নচিকেতা। তোমার মুখ এই চরাচর জগৎবৈচিত্রের আধার। ইহা গগনের গাম্ভীর্যকেও অতিক্রম করিয়াছে। এইরূপ মুখ দেখিয়া আমি অচৈতন্য হইয়া পড়িতেছি। কথা জানতে পেরে রেগে গিয়ে তাঁকে বকতে থাকেন যথাসম্ভব। কৃষ্ণ কিন্তু অস্বীকার করেন এই অভিযোগ। মাকে বলেন, বিশ্বাস না হয় তুমি আমার মুখ দেখতে পারো। যশোদা এগিয়ে এসে মুখগহ্বরে কোনো মাটি দেখতে পান না। তার বদলে দেখেন বালক কৃষ্ণের মুখের মধ্যে লীলায়িত হয়ে থাকাবিশ্বকে। মুখের মধ্যে মাছের মাথার প্রতিষ্ঠায় বাধা পড়া সত্ত্বেও সুধীরের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সেদিন নচিকেতা বুঝতে পেরেছিল সুধীরের পুরোটাই সেই মুখগহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করেছে অবাধে। ফলে পুনর্নির্মাণের স্পর্ধায় মেতে উঠেছিল সে সাময়িকভাবে। সুধীরের কোনো ছবি প্রথমে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। দুটি ঘরই তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিচ্ছিল তার সকল সহোদর এবং একমাত্র সহোদরা। তার মার পুত্রশোকের সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছিল পুত্রস্মৃতিলোপের শোক নতুন করে। এমতাবস্থায় লোকমুখে খবর পেয়ে সীমা এসে হাজির হয় সুধীরের ঘরে যথাসময়ে। ছবির এই নিদাণ অভাবের কথা জানতে পেরে

সে কোনো মন্তব্য করে না। কেবল তাকিয়ে থাকে মেঝেতে বসে সেই শয্যার দিকে যা আজ শূন্য হলেও রাতের পর রাত পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার যে খেলা তার ক্ষেত্র ছিল নিঃসন্দেহে। এই ক্ষেত্রে যে অপরিহার্য থাকে সে অবান্তর হয়ে ওঠে ক ালক্রমে। তার ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি বলে সে হয়তো তার মতো করে ধরতে চাইছিল সে কালকে দুচোখ মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে। অনেক পরে সে যখন আবার বাস্তবে ফিরে আসে, অনেক পরে সে যখন বুঝতে পারে একটি ছবি ছ াড়া শ্রাদ্ধ বাসরের আলো আটকে পড়ে যাবে যথেষ্ট পরিমাণে, তখন সে নচিকেতার কাছে এসে দাঁড়ায়। খুব আস্তে প্রকাশ করে তার মনের কথা। ---বড়দা আমাকে একবার তার একটা ছবি দিয়েছিলেন। পরিষ্কার ছবি। তখন চেহারা সুন্দর ছিল। চুলও ছিল মাথায়। আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। শুভ কাজে ওই ছবি কি কাজে লাগবে? যদি লাগে আমাকে বলবেন, আ মি এনে দেব। সীমার কথায় নচিকেতা উদ্দীপিত হয়েছিল। যে মুছে গেছে তার মুখমণ্ডল ফিরিয়ে আনার এই সুযোগ কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করতে চায় বলে সীমাকে সে না বলে পারে না--- এই ছবিটা পেলে খুব উপকার হয়। আমি ওর থেকে নতুন ছবি তুলে তোমাকে ওটা ফিরিয়ে দেব। ওটা কিন্তু এক্ষুনি চাই। এক্ষুনি এনে দিতে পারবে? তক্ষুনি সুধীরের ছবি আনতে চলে গিয়েছিল সীমা। তার অজ্ঞাত স্থান থেকে সে যে ছবি নিয়ে এসে নচিকেতার হাতে তুলে দেয় সেই ছবি থেকেই পরিবর্ধিত ও উজ্জ্বল করে নেওয়া হয় হাস্যময় এক যুবককে। নচিকেতা এমনভাবে বাঁধিয়ে আনতে পারে যাতে বেশ কয়েকবছর অক্ষয় থাকে কোনো সুধীর। আর পুনর্নির্মাণের সমস্ত ব্যয়ভাব নিঃশব্দে বহন করে সেই রূপের প্রতিষ্ঠাকে নচিকেতা স্বয়ং প্রাতঃকালে, শ্রাদ্ধ বাসর শু হওয়ার অনেক আগে, সুধীরের মায়ের হাতে সঁপে দেয়। যথাসময়ে সেটা পুরো হিতের হাতে সঁপে দেন পুত্রহারানো বৃদ্ধা। যথাসময়ে সেই প্রতিকৃতির সম্মুখে উচচারিত হয় এমন মন্ত্রযাতে কাউকেই বাদ দেওয়া হয় না। বরং স্মরণ করা হয় সর্বদিকের সবকিছু সেই তৃষ্ণার বিপুল দিগন্তে বিশেষ করে।

সেদিন সুধীরের মুখের দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বলে নচিকেতার ক্ষেত্রে কোনো অস্বাভাবিকতা খুঁজে নেওয়ার প্র শ্ন ওঠেনি। তবে সে লোকমুখে শুনেছিল তার এক সহোদর কাঁদতে কাঁদতেও খুঁজে পায় নাকি ঘুমের বড়ির কয়েকটি পাতা। সুধীরের সেই ভাই নাকি তৎক্ষণাৎ সেগুলিকে লুকিয়ে ফেলে নিশ্চিহ্ন করার জন্য। যে ডাক্তার সুধীরকে দেখছিলেন দেখতে হয় বলে, যিনি আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন অনেক আগেই, তিনি সেদিন শয্যাপার্শ্বে শারীরিকভাবে উপস্থিত হয়ে মৃত্যুর অনুমা নিক ক্ষণ নির্ধারণ করে তাঁর যা লিখে দেওয়ার তা দ্রুত লিখে দিয়ে তাঁর যা হাত পেতে নেওয়ার তা নিশ্চিন্তে নিয়ে পথে দাঁ ড়িয়ে থাকা তাঁর নতুন গাড়ির দিকে ধাবমান হন। ডাক্তারের দেওয়া ওই কাগজের জোরে দুটো ব্যাপার ঘটে নির্দ্বিধায়। একটি দেহ আগুনের মুখে তুলে দেওয়া সম্ভব হয় কোথাও কোনোরকম মুখরতা ছাড়াই। পুরোহিতও আত্মহত্যার কৃত্য না করে আত্মার কৃত্য করে যান সারাদিন খুবই আত্মগতভাবে।

ঠিক ছমাসের মাথায় দেহাবসান হয় সীমারও। জনশ্রুতি এই যে, সে অসুস্থতা অনুভব করে কারো সাহায্য ছাড়াই একা হেঁটে হেঁটে হাসপাতালে গিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। আত্মপ্রকাশের ক্ষণকাল পরেই হাসপাতালের মাটিতে এলিয়ে পড়ে তার দেহ। সংস্কৃত নাটকে রসের আলোচনা করতে গিয়ে একবার এক আলোচক একটি বাক্য প্রতিভাত করেন। কোনো কে ানো গৈরিক গোধূলিতে নচিকেতা তার ঘরে বসেই টের পায় সেই বাক্যটি খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। মনে রাখিতে হইবে, রসের প্রকৃত লীলাক্ষেত্র সহৃদয়ের আপন চিত্তগহন। সে মনে রাখে পা থেকে মাথা পর্যন্ত। মনে রাখে সেই র াসনৃত্যের কথাও যা চৈত্রপূর্ণিমায় সংঘটিত হয়েছিল কোনো এক বড়ো বাড়ির শষ্পাবৃত প্রাঙ্গনে। প্রাঙ্গণও ছিল আকারে বৃহৎ। আকাশের তলায় ঘাসের ওপর পাতা হয়েছিল অনেক চেয়ার। সে আক্ষরিক অর্থে সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিল ন া। একজনের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে গিয়ে দেরি হয়ে যায়। ততক্ষণে প্রাঙ্গণে বসন্তরাসের সমস্ত আয়োজন সমাপ্তপ্র ায়। যার সঙ্গে সে দেখা করতে গিয়েছিল সে কথা অসম্পূর্ণ রেখে প্রাঙ্গণেব দিকে এগোতে এগোতে নচিকেতাকেও তার সঙ্গী করে নিতে চেয়েছিল বিশেষভাবে। নচিকেতা তার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হয় এবং তার সঙ্গে গিয়ে বসে প্রাঙ্গণের অ াসনে। যথাসময়ে এই সত্য প্রকাশ পেল যে, মণিপুরি নাচের ওপর যে মেয়েটি একটি প্রবন্ধ লিখেছিল কিছুদিন আগে সে প্র াঙ্গণে এসেছে কৃষ্ণ হয়ে। রাধা হলো তার এক ছাত্রী। শু হলো নৃত্য। কাছেই গান হচ্ছে, বাজনা বাজছে এমন ভাষায় যা খুব চেনা নয়। কিন্তু তার মধ্যে এমন একটা কীর্তনের কান্নার ভাব আছে যা খুব চেনা। রাধাকৃষ্ণ এবং গোপীদের নাচের ত ালে তালে চলছে আবির ছোড়া। যত সময় এগোয় ততই নাচ ছড়িয়ে পড়তে থাকে এক প্রাঙ্গণ থেকে আর এক প্রাঙ্গণে নির্বিবাদে। পৃথিবীর প্রাঙ্গণের পর প্রাঙ্গণ নৃত্যের বশীভূত হলে নচিকেতা একসময় টের পায় তার বাড়ির উঠোনেই শু

হয়েছে বসন্তরাস। বাইরের ঋতুকে পরোয়া না করে আত্মপ্রকাশ করেছে ভেতরের ঋতু। আর সেই সুযোগে কৃষ্ণের ভূমিক ায়, রাধার ভূমিকায়, এমনকী গোপীদের ভূমিকাতেও সে একাই নেচে চলেছে একশো হয়ে। আর যে আবির উড়ছে, সত্যি কথা বলতে গেলে,তা কিন্তু আসলে নানা রঙের বাদ। তেমন রূপের আগুন নেই বলে, তেমন সুরের আগুনও নেই বলে ব াদ তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না এখনো। যত রঙ ছড়িয়ে পড়ছে তার চেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়ছে গন্ধ। ফলে নৃত্যমঞ্চে ফুলের গন্ধের সঙ্গে বাদের গন্ধ মিশে অদ্ভুত এক অনিশ্চয়তার জন্ম দিয়েছে ইতোমধ্যে। নৃত্যকলার ইতিহাসে স্বীক ার করতেই হবে এটা একটা নতুন সংযোজন। নচিকেতা অস্বীকার করে না বলে তার আজকাল মাঝে মাঝে সমস্যা হয় দেহভঙ্গিমা নিয়ে, প্রাঙ্গণের মাপ নিয়েও।

সুধীর যেখানে থাকত তার সামনে প্রাঙ্গণ ছিল না কোনোকালে। বরং গলি ছিল চিরকাল। কোণের দিকে দুটো ঘর নিয়ে এবং একটি ঢাকা বারান্দাকে রান্নাঘর করে নিয়ে তার যে যে বসবাস এত বছর ধরে ছিল তার সমান্তরাল হয়ে বরাবর ছিল আরো দুটি ঘর পাশাপাশি। এই ঘরদুটিতে কোনোদিন মানুষ থাকত না। অপরিসর এবং অন্ধকার এই ক্ষেত্র জুড়ে ছিল বহু পুরোনো সব আবর্জনা গৃহমালিকদের। তারা দোতলা থেকে নেমে এসে মাঝে মাঝে দুটিঘরে যা যা রেখে যেত পরে সেগুলিই আবর্জনায় পরিণত হয়ে আবর্জনার গুত্ব বজায় রাখত বছরের পর বছর। ওই দুটি ঘর থেকে সাপও বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে কালেভদ্রে। ওই দুটি ঘরে কত বিড়াল কতবার নির্বিঘ্নে প্রসব করেছে, কত ইঁদুরের পরাক্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নারীর কত নৈশ পদধবনির স্পন্দন জেগেছে বারংবার। ওই দুটি ঘরের পাশে ছিল কলঘর আর জল ধরে রাখার মতো আধার। কল থেকে জল পড়ত এবং কল বন্ধ করে দিলে জল গিয়ে জমা হতো সেই আধারে। জলকষ্টের দিনে আধারের জমা জলই পুষ এবং নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই হয়ে উঠত একমাত্র অবলম্বন। যেখানে অবগাহনের বিস্তার নেই সেখানে গাহনের সংকীর্ণতা গুত্বের দিক থেকে বিস্তার লাভ করলে দেহ সিক্ত করার যে আকুলতা জাগত যে কোনো দেশক ালেই তার মাত্রা আছে নিশ্চিত । সুধীরে শ্রাদ্ধ যে ঘরে সে শয়ন করত সেই ঘরেই অনুষ্ঠিথ হয়েছিল। তার কোনো এক ভ াই মস্তক মুণ্ডন করে সব কাজ সেরে ফেলার পর কোথাও সুধীরের আর কোনো চিহ্ থাকে না। তার সমস্ত জিনিসপত্রের বে াঝা বহন করে তার অনুজেরা ফিরে যায় তাদের নিজস্ব বাড়িতে। তারা ফিরে যাওয়ার ঠিক পরের দিন একদল মিস্ত্রি এসে ভাঙতে শু করে সেই আবর্জনার ঘরদুটি। অচিরাৎ ঘরদুটিরও আর কোনো চিহ্ থাকে না। কলঘর এবং তার অন্তর্গত জল াধারও বিলীন হয় অদৃশ্যলোকে। কয়েকদিন ঘরে বসে বসে নচিকেতা কেবল দলবদ্ধ মানুষের দ্বারা উৎপন্ন ভাঙনের প্রভূত শব্দ শুনে গেছে। তার ঘরের জানলা দিয়ে দেখেছে রাশি রাশি ধবংসাবশেষ ঝুড়িতে তুলে মাথায় চাপিয়ে যথাস্থানে ফেলতে চলছে কালো কালো মানুষ। কদিন ধরে তাদের মুখে সাকারত্বের হাসি দেখেছে। তারা একে অপরের হাতে আধখ াওয়া বিড়ি তুলে দিতে দিতে ভাত খাওয়ার আনন্দের হাসি দেখেছে। তারা এক অপরের হাতে অধখাওয়া বিড়ি তুলে দিতে দিতে ভাত খাওয়ার স্মৃতি ভাগ করে নিতে চেয়েছে যতটা সম্ভব। নচিকেতা কাছে থেকেও দূরে সরে গেছে কয়েকদিনের জন্য। তার পক্ষে কিছুতেই বোঝা সম্ভব হয়নি কোনটা ভাঙার আর কোনটাই বা গড়ার শব্দ। সে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখেছে যারা ভাঙাগড়ার সঙ্গে সারাদিন যুক্ত থাকে তারা কীভাবে দিনের শেষে মুখহাত ধুতে গিয়ে জলের উপযোগিতাকে অশেষ করে তোলে রোজ।

যারা দলবদ্ধভাবে একদিন এসেছিল তারা একদিন দলবদ্ধ ভাবে বিদায় নিলে গৃহমালিকের মধ্যে থেকে এক মধ্যবয়সী পুষ ওপর থেকে অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে নেমে এসে যে-ঘরে সুধীর থাকত, সীমা থাকত যে-ঘরে, যে- ঘরে রান্না হতো সীমা এবং সুধীর দুজনেরই লিপ্ততায় বছরের পর বছর, সেইসব ক্ষেত্রে তালা ঝুলিয়ে দেয়। সুধীর সেই পুষের লুঙির রঙ দেখতে প ায়, দেখতে পায় তার নগ্ন গাত্রের লোম, কিন্তু দেখতে পায় না কিছুতেই নতুন যে লোহার দরজা বসানো হয়েছে তার ওপ ারের বর্তমান অবস্থা। যারা ওপারে থাকে তারা নিজেরা কিছু না জানালে নচিকেতা কখনো কোনো প্রশ্ন করবে না বলে সমস্ত ব্যাপারটাই আস্তে আস্তে চলে যেতে থাকে ব্যবহারিক জ্ঞানের বাইরে। শুধু একমাস ধরে রোজ দুপুরে তার সামনে একই দৃশ্যের অবতারণা হয়ে চলেছিল। যে সর্বত্র তালা লাগিয়েছে, এমনকী তালা লাগিয়েছে মনের দরজায়, সে তার গেঞ্জিজাঙিয়ার দোকান বন্ধ করে যখন বাড়ি ফিরত তখন তার হাতে থাকত টব। সে বল বাজিয়ে রোজ তার বউকে ডেকে নতুন লোহার দরজার তালা খুলতে বলত। রমণী রোজ নীচে নেমে এসে দরজা খুলে দিলে স্বামীস্ত্রী দুজনে মিলে কিছুক্ষণের জন্য সেই নতুন ক্ষেত্রে মিলিয়ে যেত নিমেষের মধ্যে। নচিকেতা কিছু দেখতে না পেলেও দেখতে পেত হিসেব। যেখানে

একটিও টব বসানোর জায়গা ছিল না কোনোদিনও সেখানে টবের পর টব বসানোর জায়গা করে ফেলা হয়েছে। যারা অবান্তর ঘর ভেঙে ফেলেছে, জলক্ষেত্র মিশিয়ে দিয়েছে ধূলোয়, তাদের পরিসর নির্মাণের পর একমাস ধরে প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে পুরোনো দাম্পত্য ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল বলে আরো একমাস লেগে যায় টবগুলোকে প্রাণের মন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলতে। সুধীরের দেহাবসানের এক বছর পূর্ণ হতে খুব বেশিদিন বাকি না থাকলেও নচিকেতার কানে এসেছে এই খবর যে, যে -সব টবে গাছ লাগানো হয়েছে সেগুলো খুব বেশি সবুজের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে শেষে ধরে রাখতে পেরেছে খুব কম সবুজ নিটোলভাবে। যে নিষ্ঠা নিয়ে গেঞ্জিজাঙিয়ার দোকান থেকে রোজ ফিরে আসার তাড়া ছিল সেই নিষ্ঠাও হারিয়ে ফেলেছে তারঅঙ্গপ্রত্যঙ্গ। প্রথম প্রথম এ কথাও শুনতে পেরেছিল যে, পুরোনো বাড়ায় বহুদিন কেটে গেলেও নতুন ভাড়ায় কাউকে আর বসানো হবে না সাজানোগোছানো দুটি ঘরে। তাদের এইভাবেই রেখে দেওয়া হবে যতদিন না গৃহমা লিকদের কনিষ্ঠতম সদস্যের নতুন চাকরিতে স্থিতির রঙ লাগে। রঙ লাগলেই প্রজাপতি এসে বসবে। বিয়ের প্রজাপতি। বিয়ের পর কনিষ্ঠতম সদস্য তার নারীকে নিয়ে নেমে আসবে ঠিক সেখানে যেখানে একদিন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসা সুধীরের টাই খুলে দিতে উঠে আসত সীমা। জনশ্রুতিকে ভুল প্রমাণিত করে কিছুদিন বাদেই সীমা যে ঘরে থাকত খুলে দেওয়া হয়েছে সে ঘরের তালা। সেই ঘরে যে এসেছে সে অনতিদূরের একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রহরী। সে সপ্তাহে ছদিন তার বিশেষ পোষাক পরে সকালে বেরিয়ে যায়, ফেরে সন্ধের সময়। তবে দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য শোনা যায়তার পদধবনি। সে মাঝে মাঝে যায়, ফেরে সন্ধের সময়। সে মাঝে মাঝে নিজেই এগিয়ে এসে কথা বলে নচিকেতার সঙ্গে। নিজেই জানিয়েছে, সকালে উঠে সে যা যা রান্না করে তা সবই ঢাকা থাকে ভবিষ্যতের জন্য। কারণ স্নান করে কর্মক্ষেত্রে চলে যাওয়ার আগে সে চায় না ডাল, ভাত তরকারি খেতে। তখন একটা ব্যস্ততা যেমন থাকে তেমন থাকে সজাগ থাকার একটা সর্বাত্মক চেষ্টা। কর্মক্ষেত্রে যারা টাকাজমা দিতে আসছে, কিংবা আসছে টাকা তুলতে, তাদের পটভূমিতে কোনো অবাঞ্ছিত লোক এসে না পড়ে,কোনো বিপদ না ঘটে যায় এই দুশ্চিন্তার সঙ্গে যুঝতেগেলে তাকে দরজার সামনে বসে বসে ঢুললে চলবে না, পায়চ ারি করতে হবে মাঝে মাঝে চলে যেতে হবে কর্মক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে সবকিছু ভালো করে বুঝে নেওয়ার জন্য। এ অবস্থায় খাদ্যের একটা বড়ো ভূমিকা আছে। ডাল-ভাত-তরকারি খেয়ে উর্দি পরে পান চিবুতে চিবুতে বেরিয়ে গেলে কিছুক্ষণ বাদে শরীরে নামবে শৈথিল্য। উর্দিরও সম্ভ্রম রক্ষা করা যাবে না। তাই সে টাকা জমা আর তোল ার পর্বটা শেষ হলে মূল দরজায় তালা লাগিয়ে তবেই কিছুক্ষণের জন্য ঘরে ফিরে আসে। যা যা রান্না করে রেখে গিয়েছিল সে সব গরম করে - এক করে এবং শেষে খেতে বসে দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে। নচিকেতাকে সে তার দেশের কথাও শুনিয়েছে। তার দেশে যথেষ্ট জমিজমা আছে। বাস্তুভিটেতেও আছে প্রসার। মাঝে মাঝে দেশে গিয়ে সে আধুনিকতার স্বার্থে সে প্রসারকে কাজে লাগায়। তার দেশের ঘরে এমনকী আছে কাপড় কাচার কল। সেই কল ঘরের শোভাই বাড়ায় না কেবল, কার্যকরও হয় বিভিন্ন সময়ে। ---স্যার, এই যে লুঙি পরে আছি, এটা কিন্তু এখানে কাচিনি। বউ কলে কেচে আমার হাতে দিয়ে দিল আসার সময়। যেমন বউ তেমন মেয়ে। ঠিক খবর খাখে বাজারে নতুন কী চলেছে। আমি গেলেই আমাকে সব জানাবে। পাগল করে দেবে, এটা দাও, সেটা দাও। শহরের থেকে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই, এ আমি বুকে হাত রেখে বলতে পারি। প্রহরী যখন হাতে সময় পায় এবং সামনে পায় সময়ভারী নচিকেতাকে তখন সে বুকে হাত রেখে তার স্ব প্নের কথা শুনিয়ে দিতেও দ্বিধা করে না আদৌ। তার অবসর নেওয়ার বছরটা দাঁড়িয়ে নেই খুব একটা দূরে। সেই বছরটা যেদিন সত্যিই এসে যাবে সেদিন থেকে সে ব্রতী হবে তার স্বপ্নপূরণের কর্মকাণ্ড শু করে দিতে। কর্মক্ষেত্রের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে দেশের ঘরে ফিরে গিয়ে সে তার মেয়ের মুখোমুখি হবে। মেয়ে তখন পৌঁছে যাবে ঠিক স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের শেষ বছরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ছাত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে সে বুঝে নিতে চাইবে স্বাধীনতার ফলে সে কতটা পেরেছে সরিয়েফেলতে পরাধীনতাকে। এ ব্যাপারে তার সাফল্য যত কম হবে ততই তার বাবার স্বপ্ন রূপায়িত হওয়ার সম্ভবনা বেশি হয়ে দেখা দেবে নির্বিবাদে। তার বাবা তার একমাত্র কন্যার জন্য এমন পাত্র কামনা করে যে স্নাতক না হলেও চলবে। কিন্তু তাকে রোজ স্নান করতে হবে তারশ্বশুরবাড়ির স্নানাগারে। প্রহরী নচিকেতাকে বারংবার বোঝাতে চায় তার অসহায়ত ার আসল জায়গাটা কেমন। তার জমি আছে, শস্যাগার আছে, বাসভূমি আছে, আছে এতদিনের সরকারি চাকরির সুযে াগসুবিধে। কিন্তু নেই কোনো পুত্র যার ওপর নির্ভর করে প্রহরের পর প্রহর কাটানো য়েতে পারে নির্ভাবনায়। তাই কন্যা য ার গলায় মালা দেবে তাকেই তো পালন করতে হবে পুত্রের সেই ভূমিকা। অবসর নেওয়ারপর মেয়ের মুখোমুখি হয়ে

সেই ভূমিকার ভবিষ্যৎ কতটা সেটা বুঝে না নেওয়া পর্যন্ত বাবার স্বস্তি নেই। প্রহরী তার ঘরে বসিয়ে এ সব কথা শোনাতে চায় নচিকেতাকে। কিন্তু নচিকেতা তার সেই আমন্ত্রণ এমনভাবে প্রত্যাখ্যান করে যাতে সে ভুল না বোঝে, যাতে তার মনে না হয় যে, শ্রোতা হওয়ার বাসনা তার নেই খুব একটা ঘরে না গেলেও সে পথে দাঁড়িয়েই প্রহরীকে বোঝাতে চায় তার উন্মুখ হয়ে থাকার মাত্রা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। দর্শনকেও ছাপিয়ে যেতে চাইছে শ্রবন কখনো কখনো।

সব রাতে নয়, কোনো কোনো রাতে সীমা যেখানে বসে রান্না করত সেখানে নতুন মানুষ রান্না করতে বসে পড়ে। রান্নারত মানুষকে দেখতে পাওয়ার কথা নয় নচিকেতার। শুনতে পাওয়ার কথা। তা সে সত্যিই শোনে।শোনেআগুনের পাশে বসে থাকা মানুষের হস্তধ্বনি। বাটনা বাটার শব্দও আসে। এক - এক সময় গন্ধও ছাপিয়ে যেতে যায় সেই ধ্বনিকে। খুব ইচ্ছে করে প্রহরীর পেছনে দাঁড়িয়ে এই রন্ধনকর্ম লক্ষ করে যেতে। তার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়াটা নচিকেতার পক্ষে কঠিন কোনো ব্যাপার নয়। বরং এই ইচ্ছের কথা জানতে পারলে খুব খুশি হবে প্রহরী।তাকে প্রায় বরণ করে ঘরে এনে এমন জায়গায় বসিয়ে দেবে যেখান থেকে আগুনের সান্নিধ্য দীপ্তিমান যা কিছু সবইনজরে আসে অনায়াসেই। সব রাতে নয়, কদাচিৎ কখনো প্রহরী রান্না করতে করতে পার করে দেয় অনেকটা সময় ।নচিকেতা অনুমান করতে পারে নিজেকে পাত্তা না দেওয়ার প্রাত্যহিকতা থেকে কিছু সময়ের জন্য সরে থাকতে চাইছে প্রহরী। তার যা যা ভালো লাগে সবই বোধহয় সে চাইছে তার নিজের সামনে মেলে ধরতে। নচিকেতার পক্ষে যাকোনোদিনও সম্ভব হবে না প্রহরীর পক্ষে তা কদাচিৎ সম্ভব হবেও সেটা কম কথা নয় কোনোমতেই। নচিকেতা প্রতিবেশী হয়ে এমন এমন রাতে জেগে থাকতে চায় অনেকক্ষণ। কিন্তু কোনোবারই সে জেগে থাকতে পারে না। প্রহরীর রান্না শেষ হওয়ার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়ে জেগে থাকার চেষ্টা করতে করতে। এর মধ্যে একদিন রাতে তার ঘুম ভাঙে প্রহরীর ডাকে। তার জানালার সামনে অন্ধকার গলির মধ্যেদাঁড়িয়ে খুবই আস্তে খুবই সংকোছের সঙ্গে তাকে জাগানোর চেষ্টা সফল হয় অবশেষে। ---স্যার, আপনার ঘুম ভাঙালাম। কিছু মনে করলেন না তো? চোখ মুছতে মুছতে জানলার সামনে এসে দাঁড়ায় নচিকেতা। অন্ধকারেরমধ্যে লজ্জিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী। এই অন্ধকার দূরকরতে পারে ওপরের গৃহমালিকেরা। গলির আলো জ্বলে উঠতে পারে যে বোতামে হাত রাখলে সেই বোতাম তাদের সিঁড়ীর ওপরে। নচিকেতা ঘরের আলো জ্বালিয়ে দেয়। ফলে ঘরের আলোর একটা অংশ বাইরে গিয়ে প্রহরীর মুখের ওপর পড়লে উজ্জীবন হয়। ---এবার দেশথেকে দানাদার নিয়ে এসেছিলাম। এমন দানাদার এখানে পাবেন না, যতই চেষ্টা কন না কেন। আপনি খেলে আমি খুব খুসি হব। সে গ্রহণের সম্মতি জানালে প্রহরী জানলা দিয়ে মিষ্টির আধার দিতে গিয়ে শিকে বাধা পায়। দুটো লোহার শিকের মাঝখানে বাইরে থেকে ভেতরে আসার আধার কিছুতেই প্রকাশ করতে পারেনা নিজেকে । ফলে নচিকেতা প্রহরীকে বলতে বাধ্য হয়--আপনি বাইরের দরজার সামনে আসুন। আমি খুলে দিচ্ছি। প্রহরী সেই দরজার দিকে গলি ধরে এগোতে থাকে যেখানে একদিন নচিকেতার মা দাঁড়িয়েথাকতেন। তার মায়ের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান ছিল পদশব্দ। বৈরাগী একতারা মাটিতে রেখে হাত জোড় করে বলত---এসেছি। বিষয়ী কলমিশাক কুড়িয়ে থলি ভরিয়ে বলত---আসি? আর্যপুত্র সমস্ত দিনের তাপ সন্ধ্যার দরজায় ঢেলেদিয়ে বলতেন---কই গো। নচিকেতা জানে, দরজায় দাঁড়ানো তার মায়ের হাসিতে ছিল অদ্বৈতবাদ। সমস্ত লীলার মাঝে তার মায়েরহাসিতে ছিল জ্ঞানকর্মযোগ। দরজা খুলে দিলে প্রহরী তার হাতে তুলে দেয় তার দেশেব দানাদার। সে দরজা বন্ধকরতে যাবে তখনো যেন দাঁড়িয়ে থাকতে চায় উপহারদাতা। ---কিছু বলবেন? ---কিছু তো বলতেই চাই। কিন্তু ভয় হয় আপনি যদি কিছু মনে করেন। ---না না, মনে করব কেন। আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন। প্রহরী ছন্দ ভেঙে বলে তার রচনার কথা। সে আজ এক বিশেষরকমের আলুর দম রেঁধেছে। তার মার কাছ থেকে শেখা। মা তার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে এই রান্না শিখিয়েছিলেন। এই আলুর আলো তার মাকে জ্বালিয়ে দেখান তার দিদিমা একদিন। দিদিমা কার কাছ থেকে জেনেছিলেন প্রথম তা সে জানতে পারবে না কোনোদিন। ---স্যর, একটা কথা জানতে পারি? একটু বাটিতে করে দিয়ে যাব? খাবেন আমার আলু দম? নচিকেতা না করতে পারে না। একটা পারস্পর্যের বোধ চারিপাশের রাত্রিকে করে তুলেছে উন্মুখ। প্রহরী তার রচনা নিয়ে আসতে গেলে খোলা দরজার সামনে অপেক্ষা করতে থাকে নচিকেতা। আর ভাবে--দীপদানের মন্ত্র গ্রহণ করা জন্য আকাশও কি অপেক্ষারত?

ছোটোখাটো দু-একটা প্রলোভন জয় করতে পারলে ভালো লাগার পরিমাণটাও যে ছোটো থেকে যায় সর্বদা তা নয় কিন্তু কখনোই। স্নানের আগে নচিকেতা বাজারে গিয়েছিল ধূপকাঠি কিনতে। ভালো ধূপকাঠির জন্য তারদুর্বলতা অনেকদিনের। বাজারে নামী সংস্থার দামি ধূপকাঠি প্রায় সব দোকানেই পাওয়া যায়। সেই ধূপকাঠি সংগ্রহ করার জন্য কোনো ইচ্ছের জন্ম হয় না তার মধ্যে। এই সব কাঠি যত পোড়ে তত খাঁটি হয় না ক্রমশ। ক্রমশ ছড়িয়েপড়ে চতুর্দিকে এমন এক গন্ধ যার মধ্যে সরলতার স্থান নেই কোনো। মনে রাখা দরকার যে, গন্ধের মধ্যে উপযোগিতার ভাব থাকলে উপলব্ধির ভাবটা দানা বাঁধতে পারে না তেমন করে। এই ভয়ে বাজারের একটা বিশেষ দোকান থেকে ধূপকাঠি কিনে আনে সে। একটি গ্রামের দুঃস্থ মেয়েরা সে যে কাঠি জ্বালায় তার কারিগর। তারা কতটা দুঃস্থ তার হিসেব তার কাছে না থাকলেও তাদের গন্ধভাবন া কতটা সুস্থ তার হিসেব তার কাছে আছে নিশ্চিত। দোকানির হাতখালি ছিল না। তাই সে এক কোণে দাঁড়িয়ে খুচরোর অপেক্ষা করছিল। তখনই তার কাঁধের ওপর কারো ভারীহাত এসে পড়ে । সে পেছন ফিরে দেখে তার কলেজের সহপাঠী দাঁড়িয়ে আছে। তার শুধু হাতই ভারী হয়নি, সারা শরীরও ভারী হয়েছে। কিন্তু হাসিটার মধ্যে এখনো রয়ে গেছে পুরোনো দিনের ফুল্লতার একটা দাগ। সে নতুন এবং বড়ো গাড়ি কিনেছে। কয়েকদিনের মধ্যে সেই গাড়ি নিয়ে তার দেশের বাড়িতে যাবে বাবাকে দেখতে এবং গাড়ি দেখাতে। কয়েকদিন থাকবে সেখানে। ---চল না আমার সঙ্গে। এক সপ্তাহের ব্যাপার তে া। এমন গাড়ি কিনেছি যা চড়ে আরাম। কোনো ঝাঁকুনি টেরই পাবি না। মনে হবে সত্যিই পক্ষীরাজ ছুটছে। যাবি? আম াদের ওখানে অনেককিছু দেখারও আছে কিন্তু। গাড়ি চেপে সবকিছু দেখতে পারবি। আমি নিজেতোকে সঙ্গে করে সবকিছু দেখিয়ে দেব। চল ঘুরে আসবি। অশেষ কিছু ভুল বলেনি। সত্যিই তাদের দেশে দেখার অনেককিছু আছে। এমন এমন জ ায়গা আছে যেগুলিরীতিমতো। বিখ্যাত আজও। এমন এমন বস্তু আছে যেগুলি কিনতে পারলে গরিমা বাড়ে সংগ্রহশাল ারও। ---কী রে,চুপ করে আছিস কেন? যাবি না ? অশেষ অস্থির। বোধহয় ঠিক ততটাই স্থিরতার সঙ্গে কথা বলেছিল নচিকেতা। ---গেছিলাম তো। গত বছর ঠিক এইসময় ঘুরে এসেছি। অনেককিছুই দেখা হয়নি, তবে তোদের দেশের কিছু কিছু তোদেখেছি। ---তুমি ঘন্টা দেখেছ। তোকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। তুই একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মনে করিস স ারাটা অরণ্য তোর দেখা হয়ে গেল। ওসব ভাবের কথা ছাড়। কাজের কথা বল দেখি। কী দেখেছিস বল আমাকে। দোকা নির হাত থেকে খুচরো গুনে নিতে নিতে নচিকেতা বুঝতে পারে দেখার হিসেব পাওয়ার জন্য সত্যিই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে কলেজে তার দেখা সবচেয়ে ছটফটে ছেলেটি। নচিকেতার কাজটাকে সহজ করে দেওয়ার জন্য অশেষ বিশেষ কিছু জায়গ ার নাম এনে ফেলে প্রাকারে তার সামনে এক এক করে। এমন এক জায়গার নাম করে যেখানে ভাদ্রমাস ধরে যে পুজো চলে ত া নিরবচ্ছিন্ন। যে মূর্তি গড়া হয় তার বিসর্জন হয় সংক্রান্তিতে। মূর্তির মধ্যে রূপের প্রাবল্য আছে। সারা রাত ধরেমেয়েরা গান গায় সেই মূর্তির সামনে বসে। এমন আর এক জায়গার নাম করে যেখানে পেখম তোলা বাঁশের ময়ূর। এমন সব আখড়ার কথা বলে যেখানে বাউলের গলা থেকে বেরিয়ে আসে বেদনার গোধূলি যখনতখন। এমনহাটের কথা তোলে যেখানে দামি শাঁখের বদলে সস্তার শাঁখা ঝলমল করে। আর আদিবাসী মেয়েরা সেই শাঁখা হাতে পরে যখন ঘরের পথ ধরে তখন যে তাদের মুখমণ্ডলেও বিরাজ করে একটা ঝলমলে ভাব তাঅশেষ বলে না দিলেও কল্পনা করে নিতে পারে নচিকেতা। অশেষ শেষ পোড়ামাটির শিল্পীদের কথা তুলেছিল। তুলেছিল সেই গ্রামের কথা যেখানে তাঁতিদের হাতে রেশমের সুতো উঠে আসায় হারানো শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ শু হয়ে যায়ঘরে ঘরে। ---বলতে চাস সব তোর দেখা হয়ে গেছে? কী রে নচি, চুপ করে থাকিস না, জবাব দে। নচিকেতা স্বীকার করে অশেষ যেগুলির কথা বলেছে সেগুলি সে দেখেছে বইতে, বিশেষজ্ঞের লেখায়, কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নয় কখনো। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সে তার দেশের এমন কিছু দেখেছে যেগুলি তুচ্ছ নয়। সম্পূর্ণতার সঙ্গেকোথাও- না - কোথাও যুক্ত হয়ে আছে সেসব। অশেষকে সে তার কথা বোঝাতে পারে না। কিংবা বিশেষ দোকানথেকে বিশেষ ধূপকাঠি কিনতে এসে সে চায় না বক্তব্যের জন্ম দিতে। অশেষ থামে না। সে তাকেপ্রলোভিত করার চেষ্টাকরতে থাকে দশ দিক দিয়ে। কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয় তা প্রাক্তন সহপ াঠীর কোনোরকম চেষ্টার অনুপস্থিতিতে।

মাঝে মাঝে কী যে হয়, স্নান করে ধূপ জ্বালিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারাটাকেই মনে হয় বসচেয়ে জরি কাজ। যার ছুটছে তাদের দেখাদেখি আর ইচ্ছে করে না ছুটতে। যারা অনেককিছু বুঝে গেছে, মুখে এনে ফেলেছেএক টুকরো আত্মবিশ্বাসের হ াসি তাদের সঙ্গলাভের ইচ্ছেটাও তলানিতে এসে ঠেকে প্রায়। যারা তর্ক করে সুখ পায়,যারা কথায় কথায় প্রমাণ দাবি

করে সর্বস্তরে, যারা হারব না এই প্রতিজ্ঞা করে ঝাঁপিয়ে পড়ে দিগন্তের দিকে, তারা তাদের কাজ করে যাক, ভালো থাকুক তারা, কেবল একা থাকতে দিক তাদের যারা একা থাকতে চায় স্নান করে উঠে ধূপ জ্বালিয়ে আপনমনে। এমনই এক কামনা করে নচিকেতা কখনো কখনো বিপুলভাবে। মাঝে মাঝে ধূপের ধোঁয়াও আর লতানো থাকে না। তার মধ্যে যে বলয়ের ভাবটা দেখা যায় সাধারণত, সেটা লুপ্ত হয়ে এসে পড়ে একেবারে একটা রেখা হয়ে ওপরে উঠে যাওয়ার প্রবণতা। বোধহয় ধূপেরও একেবারে নিজস্ব পতাকা ওড়ে কোনো কোনোবিশেষ সময়। এখন যেমন দেখতে পাচ্ছে সেই পতাকার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে পড়ে যাচ্ছে সবই,কখনো এক - এক করে, আবার একই সঙ্গে কখনো বা।

যে পাহাড়টা নিয়ে অশেষদের খুব গর্ব একদিন সকালবেলায় নচিকেতার পক্ষে, সম্ভব হয়েছিল সেই পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে পড়া। সে ঘরে বসেও কত বছর আগে এই পাহাড়ের কথা শুনেছে। যারা পরে বড়ো বড়ো পাহাড়ে চড়বে তাদের এই পাহাড় থেকেই ওপরে ওঠা শিখতে হয় আজও। যে পাহাড় থেকে শৈলভাষার বর্ণপরিচয় হয়তার সামনে দাঁড়িয়ে সে জেনেছিল প্রথম দিকের বৃষ্টির ছোঁয়ায় যা সবুজে ঢাকা বসন্তের শেষদিকে তার রিক্ততা চরমে উঠে যায়। তাকে নেড়া বললেও সত্যের অপলাপ হয় না তখন। সে জেনেছিল পাহাড়ের মাথায় যে ঝর্না আছে,তার ক্ষমতা নেই পাদদেশের ঝর্নার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার। পাদদেশের ঝর্না দিয়ে মোটা ধারায় অকাতরে জল পড়ছেসারাক্ষণ। কত স্থানীয় মানুষ সেই জল দিয়ে কত বিভিন্ন মাপের জলধারা পূর্ণ করে ছড়িয়ে পড়ছে কত দিকে রোজ। নচিকেতা তার মাহাত্ম্য বুঝতে পেরে এগিয়ে গিয়েছিল সাবধানে। তার হাতে কোনো জলাধার ছিল না। তার জিভেও ছিল না তেমন কোনো শুষ্কতা নিশ্চিত। কেবল তার মুখমন্ডলে ছিল যা নেমে আসছে তাকে নত হয়ে গ্রহণ করার ইচ্ছে। গ্রামের লোকেরা সিংহের মুণ্ড স্থাপিত করেছে ঝর্নামুখে। ফলে নচিকেতা সিংহের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা জলদিয়ে তার মুখ ধুয়েছিল, ধুয়েছিল তার চোখ। সেই ধোয়া চোখ দিয়ে সে ভালো করে দেখেছিল তাদের যারা এই পাহাড় থেকে পাথর নিয়ে মূর্তি, থালা, গ্লাস তৈরি করে পাহাড়ের পাদদেশেই বসে আছে ক্রেতার অপেক্ষায়। তার সামনেই কেউ কেউ নতুন মূর্তি গড়ছিল ছেনি দিয়ে। সে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে জেনেছিল খুব সূক্ষ্ম কাজ এই পাহাড়ের পাথরের বুকে এনে ফেলা সম্ভব হয় না সব - সময়। এই পাথরে বালির ভাগ বেশি থাকায় তা বেশ শক্ত। যখনইপরিসর ছোট হয়ে পড়ে তখনই দেখা যায় সমস্যা। কেউ কেউ বাণিজ্যের অনেকরকম সুবিধের কথা ভেবে অন্য জায়গায় অন্য পাহাড়ের অন্য পাথর দিয়ে কাজ সারে এই পাহাড়ের নীচে বসেই স্বচ্ছন্দে। তাদের দেখা পেতেও বেগ পেতে হয় না নচিকেতাকে। তবে সে চেয়েছিল যারা খোদাই করছে তাদের কাছে ঘুরতে ঘুরতে একটা থালা আর একটা গ্লাস নির্বাচিত করার সুযোগ পেতে অকস্মাৎ। ছেলেবেলায় দেখেছে তার গৌর পিতামহীকে কৃষ্ণ পাথরের থালায় ভাত ঢেলে কত তৃপ্তির সঙ্গে আলুভাতে আর লঙ্কা দিয়ে খেতে। তাঁর পাথরের গ্লাস ভরে উঠত কোনো কোনো সকালের মাঝখানে বেলপানায়। তাঁর অবসানের পরে বেশ কিছুদিন সেই থালা ও গ্লাস নচিকেতার মায়ের তত্ত্বাবধানে বেঁচে ছিল। ব্রাহ্মী হরফ আর সংস্কৃত ভাষায় এই পাহাড়চূড়ার একটি গুহাগাত্রে দুটি লিপির কথা জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। লিপির পাঠ নিয়ে তাঁরা কিন্তু একমত হতে পারেননি। ওপরে বিরাজ করছে মতভেদ। যত ওপরে ওঠা যায় ততই কি ফুরিয়ে আসে অভিজ্ঞতা? নচিকেতার ওপরে ওঠার সামর্থ্য নেই। সে নীচে দাঁড়িয়েই বুঝতে পেরেছিল তার শৈশবের থালা ও গ্লাস ছড়িয়ে রয়েছে চতুর্দিকে।

সেদিন ওই পাহাড় থেকে পথে একটি মন্দিরের সন্ধান পায় নচিকেতা। মন্দিরে মহাবিষ্ণুর বিগ্রহ। তখনপুজো শু হয়ে গেছে। যেখানে মন্দির তার কাছেই একটি স্থায়ী মণ্ডপ দেখে সে বসেছিল সেই মণ্ডপের চাতালে গিয়ে।মণ্ডপের পেছনদিকে যতদূর দেখা যায় কেবল ইউক্যালিপটাস। ফলে পশ্চাদ্‌দেশে এমন একটা বিজন ভুবন রচিত হয়ে আছে যাকে প্রাঙ্গণের মর্যাদা দিয়ে নিজের করে নিতে ইচ্ছে করে অহরহ। এমনভাবে সে উপবেশন করে যাতে একদিকে থাকে মন্দিরের নির্মাণ এবং আর একদিকে থাকে নির্মাণের মন্দির। অনতিদূরে পূজারী ক্রিয়াশীল। এই মানবমূর্তি ছাড়া আর কোথাও কোনো মানুষ সেই সময়ে চোখে পড়েনি তার। পূজো শেষ হলে গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আস্তে আস্তে এক বৃদ্ধ মণ্ডপের চাতালের দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। নচিকেতা ভেবেছিল তিনি হয়তো মণ্ডপ ছাড়িয়ে নিঃশব্দে চলে যাবেন সেইদিকে যেখানে সত্যিই নির্মেদ আর সুদীর্ঘ সব প্রকাশের মাধ্যমে ছড়িয়ে আছে হারিয়ে যাওয়ার সুযোগ সারাক্ষণ। কিন্তু তিনি ছিলেন একাগ্র এবং তাঁর লক্ষ্য ছিল স্থির। ফলে তিনি একসময় চাতালের সামনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে নচিকেতাকে গ্রহীতা করে তুললেন। সে গ্রহণ করল কলার টুকরো ও বাতাসা। তিনি তার পাশেও বসেছিলেন খানিকক্ষণ। মহাবিষ্ণুর

আসল বিগ্রহ চুরি যাওয়ার কথা তাঁর কাছে থেকেই জানতে পেরেছিল সে। এও জেনেছিল বিকল্প বিগ্রহ যে পাহাড় দেখে সে কিছুক্ষণ আগে প্রত্যাগত তারই পাথরে গড়া। পূজারী বিদায় নেওয়ার সময় সে জানতে চেয়েছিল আরো কিছুক্ষণ এখ ানে বসে থাকা যাবে কিনা। সারাদিন বসে থাকলেও কেউ কিছু বলতে আসবে না এ কথা শোনার পর সে বেশ কিছুক্ষণ একেবারে একা বসেথেকে শুনতে চেয়েছিল বয়ে যাওয়া হাওয়ার ভাষা, পাতার শব্দ এবং সময়ের সমাপ্তিগীত। সে বুঝতে পেরেছিল, যে- মন্দিরের আসল বিগ্রহ অপহৃত সেই মন্দিরের সামনেই বসে থাকতে থাকতে তার মতো অনেকেরই বেলা বাড়ছে দেশ - দেশান্তরে প্রতিনিয়ত।

সেদিনই বিকেলের দিকে যে ঘর গম্বূজাকৃতি, যে ঘরে কয়েকদিন ধরে তার রাত্রিবাস, যে ঘরের ছাদ গড়ে উঠেছে অবিশ্রম খড় আর টালি দিয়ে সেই ঘরে বসে থাকতে থাকতে সে জানলা দিয়ে দেখতে পেল সামনের অঙ্গনে ধীরে ধীরে এসে জড়ো হচ্ছে আশপাশের গাছপালায় ঢাকা গ্রাম - গ্রামান্তর থেকে আবালবৃদ্ধ বনিতা। যারা অতিথির জন্য বড়ো আকাশের তল ায় গম্বুজাকৃতি চুড়ো গড়িয়েছে সামনে তাদের অনেকটা জমি, বিঘে পড়ে আছে অনেকটা জায়গা জুড়ে বিভিন্ন ফসলের চ াষ হয়। একটা ইঁদারাকে অনেকটা জায়গা জুড়ে এমনভাবে বাঁধানো হয়েছে যে দশজন বসে স্নানের আগে গল্প করলেও অসুবিধে হবে না। একটা ঘেরা জায়গায় মাটি কেটে পুকুর ফোটানোর কাজএগিয়ে গেছে অনেকটাই। এত সব খাতে জমির ব্যবহার ঘটে গেলেও বেশ কিছু জমি বাকি পড়ে থাকে যা দিয়ে বড়োরকমের অঙ্গন হতে পারে চিরকাল। এখানে সেটা হয়েছেও। এমন জায়গাও আছে যেখানে শহরের বাবুদের বড়োবড়ো গাড়ি এসেও দাঁড়াতে পারে, দাঁড়াতে পারে সেইসঙ্গে গ্রামের বাবুদের দ্বিচত্রযান একাধিক। কদিন ধরে জানলাদিয়ে নচিকেতা বিভিন্ন প্রহরে দেখেছে শহরের ধুরন্ধরত ার সঙ্গে সমানে টক্কর দিচ্ছে গ্রামের ধুরন্ধরতা। আশপাশের কোনো গ্রামেই বিদ্যুতের আলো নেই আজও। কিন্তু সে যেখ ানে আছে সেখানে কাছে লাগানো হচ্ছে সৌরশক্তি। ফলে মলমূত্রত্যাগের যে ঘর তার মেঝের মার্বেল পাথরও উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারছে নিশীথে। অঙ্গনও আলোর দাক্ষিণ্যথেকে বাদ পড়েনি। রাত্তিরে অঞ্চলের একমাত্র আলোকিত অঙ্গনে ম ানুষের সমাবেশ ঘটে রোজ। যতদিন শহরের মালিকের বিপুলায়তন গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে ততদিন মালঞ্চের মালীরও নিস্ত ার নেই। তাকেও উড়ে আসতে হয় আলোর দিকে বেগে। যার আতিথ্য গ্রহণ করে দিগন্তের মাঝখানে বহুমূল্যবান ঘরে খড় আর টালির ছাদের নীচে কয়েকটা দিন কাটানোর সুযোগ পেয়েছিল নচিকেতা, তাকে রোজ ঘিরে থাকা মানুষজনের বাইরেও আরো অচেনা কিছু মানুষঘিরে ধরে আস্তে আস্তে সেদিন বিকেলের দিকে সঙঘবদ্ধ হচ্ছিল। জানালা দিয়ে আর কতটুকু দেখা যায়? তাই প্রথমে সে কেবল দেখতে পেয়েছিল সমাবেশের উদীয়মানতা। পরে সে দেখতে পায় একটি রথ। স ামান্য উচচতার সেই আয়তন লাল কাগজ দিয়ে সাজানো। বিকেল পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রথকে ঘিরে সূচনা হয় একটা মিছিলের। মিছিল নাকি শোভাযাত্রা? কোনটা যে কার সঙ্গে মিশে থাকে তা ঠিক তার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠে না সবসময়। যাই হোক নচিকেতা শেষপর্যন্ত দেখতে পায় একটি মনুষ্যধারা এগিয়ে যাচ্ছে একটি রথ সামনে রেকে সেইদিকে গ্রাম ও গ্রামান্তর যেদিকে বিরাজমান গাছগাছালির অন্তরালে থেকে চিরকাল। সংকীর্তন ও শু হয়ে যায় একটা বাঁক থেকে আর একটা বাঁকে উপনীত হওয়ার মুখে। জানালয় দাঁড়িয়ে সে একটি বিলীয়মান ধবনিরই কেবল গ্রাহক হয় ন া, সেইসঙ্গে ভাবুক হওয়ারও সুযোগ পেয়ে যথেষ্ট পরিমাণে। কারণ কোনো কোনো ফসল কোনো কোনো ক্ষেত্রের বুকে দীপ হয়ে জ্বলে ওঠার প্রতীক্ষায় পৌঁছেছে নিঃসন্দেহে। ফলে সে আর জানালার সামনে বসে থাকতে পারেনি।কারণ তার কান্না পায় আজকাল যখনই কোনো সমন্বয়ের সামনে এসে পড়ে হঠাৎ। সে বাইরে বেরিয়ে এসে অঙ্গনের কোনো এক দিকে বেশ নির্দল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। যার অতিথি হয়ে এসেছে যে নিজে ঝকঝকে ধুতিপাঞ্জাবি পরে সেই মনুষ্যধারার অন্তর্গত হয়েছে বলে তাকে জগন্নাথের মাসির বাড়ি থেকে তুলে নিতে তার গাড়ির চালকও গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সে অঙ্গনে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে । অত বড়ো গাড়ি সামনে থেকে হঠাৎ তিরোহিত হলে শহরের মানুষের মধ্যে একটা অস্বস্তির অনুভব যে হয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নচিকেতা তারই অঙ্গনে দাঁড়িয়ে খুঁজতে চেয়েছিল যারা মিছিল বা শে াভাযাত্রায় যোগ দিতে পারেনি তাদের সঙঘ। ভিড় বলে আর কিছু ছিল না কোথাও। দু - একজন দু - একজনের পাশে দাঁ ড়িয়ে কখনো চুপ করে থাকছে, কখনো বা কথা বলছে চুপিচুপি। নচিকেতাকে দেখলেই থেমে যাচ্ছে কথা। তার বদলে শু হয়ে যাচ্ছে নচিকেতাকে দেখে চলার নীরবতা। সে আর অপেক্ষা না করে এগিয়ে গিয়েছিল এমন একটা জটলার দিকে যেখানে একটি মানুষকে ঘিরে আছে একটি প্রাণী সারাক্ষণ। নচিকেতা ফুল্ল হয়ে জানতে চায় মানুষের কাঁধে কে বসে আছে

শেষপর্যন্ত। সে উত্তরও পেয়ে গিয়েছিল তৎক্ষনাৎ। ---এটা একটা বেজি। এর নাম ঝন্টু। ঝন্টু, তোর দাঁত দেখিয়ে দে ব াবুকে। সাপ কাটিস যে দাঁত দিয়ে তা দেখিয়ে দে। ঝন্টুদেখায় না কিছু। সে যার কাঁধে সেই দেখায়। তাকে কাঁধ থেকে না মিয়ে মুখ ফাঁক করে দেখিয়ে দেয় তার দাঁত। সেযেখানে ছিল সেখানে তাকে স্থাপিত করে প্রায় দিগন্তের দিকে তাকিয়ে নচিকেতাকে শ্রোতা করে সে বলে ওঠে ---আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না। আমি যেখানে যাব আমার সঙ্গে যাবে। শ্রোত াও এই সত্যের খুব বেশি মুখোমুখি হওয়ারসাহস না দেখিয়ে সরল প্র্ন করেছিল। ---কী খায় ও ? খুব খুশি হয়ে উত্তর দেয় বাহক। ---দুধভাত খায়। সাদা মাংস দিলেও খেয়ে নেবে। ---সাদা মাংস মানে? ---কাঁচা মাংস। কাঁচা মাংস ছাড়া খাবে না। নচিকেতা সেই বেলাশেষেরঅঙ্গনে দাঁড়িয়ে মনে করতে চাইছিল এক সপ্রতিভ রমণী ছবির পর্দায় দাঁড়িয়ে কিছুদিন অ াগে শহরের ঘরে ঘরে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তার অনুপুঙ্খ। একটি নতুন চ্যানেলে, সামান্য বিস্তার হয়েছে এমন একটা ক্ষেত্রে বসে সে একটা চ্যানেলে সেই একই সময়ে সে এমন একজনকে সকলের সামনে হাজির করবে যে ফাঁস করে দেবে একেবারে নতুন একটা রান্নার নাড়িনক্ষত্র। রান্নার শিরোনাম তাও মনে আছে নচিকেতার। মাংসের পায়েস। এতদিনে নিশ্চয় ফাঁস হয়ে গেছে সব রহস্য এবং আয়েশ করে পায়েস খাওয়ার লোকও নিশ্চয় ক্রমবর্ধমান। সেই অচেনা অজানা রসিকদের উপভোগের সমগ্রতার কথা ভাবতে ভাবতে আর সেই অঙ্গনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। যে অঙ্গন পেছনে রেখে হাঁটতে শু করছিল। সে চলে গিয়েছিল একেবারে অন্যদিকে। যার সঙ্গে তার অতিথি হয়ে শহরে থেকে এসেছে সে যেদিকে গেছে তার একেবারে উলটোদিক থেকে শু হয়েছে চলেছিল তার চলা, তার আপনমনে এগিয়ে যাওয়া, তার পদে পদে হারিয়ে যাওয়া অচেনা অজানা সবগাছপালার মধ্যে। খুব বেশিদূর সে এগিয়ে যেতে পারেনি, পরেও না কে ানোদিন। তার কারণ তার ভয় আছে, মায়া আর পিছুটান আছে, এমনকী আছে বারংবার ফিরে আসার প্রবৃত্তি। তাকে অ াটকে দিয়েছিলো শঙ্খধবনি। যে গ্রাম দেখা যায় না, ঢাকা পড়ে থাকে, কেবল অনুভবে ধরা পড়ে কোথাও, তেমন কোনো গ্রামের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার কানে আসে সন্ধে। ফলে সে প্রত্যাবর্তন করে।

পরের দিন সকালে সে যার অতিথি হয়ে এসেছে সে উদ্যোগী পুষ তাকে একটি সভার কথা বলে যা জরি এবং যা সেদিন বেলা এগারোটা নাগাদ শু হবে এমন একটি জায়গায় যেটি ঠিক অশেষদের জেলার মধ্যে পড়েনা, পড়ে একেবারে পাশের জেলায় সীমান্তবর্তিতার সমস্ত চরিত্র বজায় রেখে। ---গেলে তোমার খারাপ লাগবে না। যাবে ? একা একা সারাদিন এখ ানে বসেই বা কী করবে। আমি তো সেই সন্ধেবেলায় ফিরব। নচিকেতা দেরি না করে রাজি হয়ে যায়। সে জানে একাকিত্বের নানা স্তর আছে। সব স্তরের সবরকম একাকিত্ব সহনীয় নয় সমানভাবে। কোনো কোনো একাকিত্ব যেমন দেয় ঋদ্ধতা তেমন কোনো কোনো একাকিত্ব আবার প্রদান করে শূন্যগর্ভ ভার। বেলা এগারোটার বেশ কিছু আগে তারা সীমান্ত পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল সভাস্থলে। যেখানে তখনো যাদের আসবার কথাতারা কেউই এসে পৌঁছোয়নি। নচিকেতা ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে সেই বিদ্যালয়ভবন যার সব ঘরই একতলায়। ওপরে ওঠার কোনো সুযোগ নেই কোনোভাবেই। কোনো কে ানো ঘরের বোর্ডে গতদিনের পড়াশোনার প্রমাণ ছড়িয়েরয়েছে। শিক্ষক চলে যাওয়ার সময় চকের লেখা আর মুছে দিয়ে যাননি। ফলে বীজগণিতের ভুলে যাওয়া সূত্র বহু বছব বাদে জীবনের প্রায় প্রান্তবেলায় সে প্রত্যক্ষ, করল আবার দ্ধ ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে। জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতেথাকতে তার মনে পড়েছিল কৈশোর। কত অনায়াসে বীজগণিতের এক - একটা সূত্র ধরে সে পৌঁছে যেতে পারতএকের পর এক সমাধানে দ্রুত। তাঁর হাতে খাতা তুলে দিলে কত খুশি হতেন গণিতের গোলগাল হাসিখুশি শিক্ষক। ---এততাড়াতাড়ি করছে, অথচ একটাও ভুল হয়নি। আমাকে তো excellent কথ াটা লিখে দিতেই হবে। এখন না লিখলে আর কখন লিখব। তাঁর সেই সইকরা মন্তব্য নিয়ে ছুটে গিয়ে আসনে বসত নচিকেতা আর একটা নতুন অধ্যায়ের সমাধানে নেমে অনতিবিলম্বে আর একটা সইকরা মন্তব্য অর্জনের আশায়। বীজগণিতের ক্লাসে এভাবেই তাকে মাতিয়ে রেখেছে চিরদিন সঞ্চয়ের নেশা। এত বছর বাদে কোথাও আর তেমন কোনো আনন্দপ্রদ সঞ্চয় নেই বলে মাঝে মাঝে কেমন এক নিঃস্বতা তাকে ঠেলে দেয় সঞ্চয়ের স্মৃতির দিকে। সে যার অতিথি হয়েছে তার উচচরবে তার আর বোর্ডের দিকে তাকিয়ে থেকে স্মৃতিভুক হওয়া সম্ভব হবে না। ---গ্রামের ঘড়ি, বুঝতেই পারছ শহরের ঘড়ির থেকে একটু দূরত্ব চেপে রেখে চলে। চলো ততক্ষণে একটু ঘুরে আসা যাক। আমাদের কাজ দেখে নিতে প ারবে।

বড়ো গাড়িটা একটু চলেই থেমে গিয়েছিল। গাড়ি ঘিরে ধরেছিল যারা তার একটা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তাদের

পুর্বপুষদের মতো তারাও এই মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে এই মাটিতেই বড়ো হয়েছে। নচিকেতা যার অতিথি তাকেদেখে তারা যে হাস্যময় হয়েও তটস্থ কিছুটা তা বোঝা যাচ্ছিল বেশ। তারা তাকে সঙ্গে করে জমির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এই এগিয়ে য াওয়ার খবর পেয়ে একই সম্প্রদায়ের মানুষ এগিয়ে এসে পুষ্ট করছিল ভিড়। প্ল্যাস্টিকের আবরণের মধ্যে মাটি ভরে বীজ বপন করে সেগুলো পরপর বসানো হয়েছে। বীজ থেকে চারা বের করে আনার কাজ চলছে একদিকে। আর একদিকের ক াজ হলো সেই চারা তুলে এনে বৃক্ষরোপণ। সে যার অতিথি হয়ে এসেছে সে নিজে অনেকের দৃষ্টির আতিথ্য গ্রহণ করতে করতে নিজস্ব দৃষ্টিকে অতন্দ্র রেখে বপন ও রোপণের হিসেবের গোলমাল কতটা তা ধরে ফেলতে চাইছে মুহুর্মূহু। মুহুর্মুহু নেমে আসছে ধমক এবং তলব করা হচ্ছে কৈফিয়ত। কেবল একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মানুষই নয়, কোথায় যেন কেঁপে উঠছে নচিকেতাও সমানতালে। তারও তো এ পর্যন্ত বপন ওরোপণের হিসেবের মধ্যে ঢুকে বসে আছে নানা আকারের সুদর্শন গরমিল। কৃষ্ণকালো হয়েও মূলত সুদর্শন একটিযুবক সাম্প্রদায়িক হয়েও সপ্রতিভ। তার বুকের বাঁদিকে একটি সুর বেজে ওঠে। এই সুরের মধ্যে আসলে খুবই পরিচিতএক দেশাত্মবোধক গান লুকিয়ে আছে বেরিয়ে আসার জন্য। সে সঙ্গীতের আত্মপ্রকাশে বাধা দিয়ে বুকের বাঁদিকে থেকে একটি ছোট্ট অবয়ব বের করে তুলে ধরে কানের কাছে। যে যোগ াযোগ করতে চাইছে তাকে পাঠ্য ভাষায় নিশ্চিন্ত করে তৎক্ষণাৎ। যে দাপটের সঙ্গে একটির পর একটি বীজের বিছানায় ঝুঁকে পড়ে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত তার কানের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে। ফলে সে সোজা হয়ে এবং নচিকেতার দিকে তাক ায় হেসে। ---চলো। পাঁচ - দশ মিনিটের মধ্যে সভা শু হয়ে যাবে। পঞ্চায়েতপ্রধান এসে গেছেন। নচিকেতা ফিরে গিয়ে দেখে বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে কোনো অভাব নেই শ্রোতার।

সে সভা শু হলে একেবারে শেষদিকে বসে দেখেছিল প্রথমভাগের কাজকর্ম। প্রথম ভাগে বহু দূর থেকে আসা বেশ কিছু মেয়ের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার একটা অধ্যায় ছিল। এইসব মেয়েরা কর্তাদের বিচারে বপন, রোপণ ও সমন্বয়স াধনের ব্যাপারে কাজ করছে আশানুরূপ সম্প্রদায়ের সেই সুদর্শন যুবক এক - একটি মেয়ের নাম ঘোষনা করছিল। যার নাম ঘোষিত হচ্ছে সে মঞ্চে উঠে এলে যুবক একটি ছাতা ও একটি ক্যালেণ্ডার যার অতিথি হয়ে এসেছে নচিকেতা তার হ াতে তুলে দিচ্ছিল সন্তর্পণে। সে আবার সেগুলি হেসে হেসে পঞ্চায়েতপ্রধানের হাতে তুলে দিলে শেষে তারই মাধ্যমে সেসব পৌঁছে যাচ্ছিল প্রাপকের হাতে। এই পর্ব চট করে শেষ হতে পারেনি। কারণ হাতের সংখ্যার সঙ্গে সমানতালে পা ল্লা দিচ্ছিল হস্তমুদ্রার সংখ্যা। সেখানে গ্রহীতার কৃতজ্ঞতার পাশে দাতার কৃতবিদ্যতাও মূর্ত থাকতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়ভ াগের কাজকর্মের মধ্যে আলোচনা এবং ভাষণই ছিল প্রধান। নাচিকেতা আকর্ষণ অনুভব করেনি। সভাস্থল থেকে বেশ খা নিকটা সরে গিয়ে সে যেখানে বসে সেটা একটা বৃহৎ প্রস্থরখণ্ড। আর সামনেই জলাশয়। সে অবাক হয়ে দেখে জলাশয়ের বেশ খানিকটা জুড়ে ফুটে থাকা পদ্ম। বাকি অংশের জলে মধ্যাহ্নস্নান সেরে নিচ্ছে এক - একজন এক - একভাবে এসে। মনে রাখা দরকার যে, স্নানপর্বে তেমন কোনো কৃতজ্ঞতা তেমন কোনো কৃতবিদ্যতার সঙ্গে মিশে তেমন কোনো জলমঞ্চ গড়ে তুলতে পারেনি। তবে কেউ কেউ জলে নেমে ডুব দিয়ে উঠে যখন গাত্রমার্জন করছিল তখন পদ্মের সীমানাচিহ্নের দিকে দৃষ্টিপাত করে নচিকেতা বুঝতে পেরেছিল মানুষের একান্ত আপন দিনযাপনের মধ্যেই তার উদয়ন কিংবা তার ফুটে থাকা লুকিয়ে রয়েছে স্তরে স্তরে। ওই পদ্মাচ্ছন্ন জলাশয়ের পাশে বসেই অনেক পরে তার দৃষ্টি যখন বহু দুরের পথের দিকে চলে যায় তখন সে সত্যিই আবিষ্কার করতে পারে তাদের যারা আজ পুরস্কার পেয়েছে। তারা প্রত্যেকে কাঁধে নতুন ছাতা রেখে তাদের গ্রামের দিকে হেঁটে চলেছে। নচিকেতা বুঝতে পারে যত রোদই উঠুক ছাতা কাঁধ থেকে উঠবে না মাথায় ওপরে। সে শুনেছে তাদের গ্রাম অনেক দূরে। দলবদ্ধ ভাবে চলতে চলতে যারা মিলিয়ে যাচ্ছে প্রস্তরখণ্ডের ওপর বসে তাদের কথা ভাবতে ভাবতে সেদিন সে একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েও খুঁজে পায়নি তেমন কোনো সন্তোষজনক সমাধান। জলের পদ্ম এবং স্থলের পদ্ম কে কোনদিক থেকে কতটা এগিয়ে।

সভা ভেঙে গেলে যেখানে মধ্যহভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই টালির ঘরের সামনে এসে থেমেছিল সেই বড়ো গাড়ি। নচিকেতা মাটিতে বসে শালপাতায় গরম গরম ভাত ডাল আর ভাজা খেয়ে পরিতৃপ্ত হতে পেরেছিল বলে মাছের ঝোলের দিকে কিছুতেই হাত বাড়াতে পারেনি সেদিন। টালির ঘরেই বিশ্রামের যথেষ্ট জায়গা ছিল। তাকে সেই সুযোগের হাতে রেখে গাড়িতে গিয়ে উঠেছিল উদ্যোগী পুষ। ---তুমি ইচ্ছে হলে একটু গড়িয়ে নিতে পারো। আমার তো সে উপায় নেই। আমাকে এক্ষুনি একবার বি ডি ও-র সঙ্গে বসতে হবে। এই কাজটা হয়ে গেলেই এখানকার কাজ শেষ। বড়ো গাড়ি ছেড়ে

দিলে সে বসে থাকতে থাকতে শুনতে পায় একসময় এক শতায়ু বৃদ্ধের কথা।তিনি খুব কাছেই বিরাজ করছেন। সূর্যাস্ত হয়ে গেলে তাঁর সঙ্গে আর দেখা করা যায় না। তিনি তখন তাঁর ঘরে ফিরেযান নিঃশব্দে। যারা নচিকেতার সামনে দিয়ে যায় ত ারা বলাবলি করে তাঁর মহত্ত্বের কথা। মানুষ লাইন দিয়ে থাকেতাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর জন্য। তিনি আর্তকে বিনামূল্যে ওষুধ দেন। সে খোঁজ নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল সেই ক্ষেত্রে। একটা বটগাছের ঝুরি নামতে নামতে এমন এক আয়তন রচনা করেছে যাতে প্রজ্ঞাবান মনে হবে সেই বৃক্ষকে। সেই বৃক্ষের বাঁধানো চাতালে বসেছিলেন সেই বৃদ্ধ। ধীরে ধীরে এক-একজন করে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। একসময় নচিকেতাও পৌঁছে যায়। তিনি হাতজোড়া করে জানতে চান---আপন ার কী অসুবিধে হয়? নচিকেতা কিছুই প্রকাশ করতে পারেনি। সময় নষ্ট না করে সরে এসে পরের লোককে সে সুযোগ করে দিয়েছিল। আজ এই মুহূর্তে তাঁর মুখোমুখি হতে পারলে হয়তো তাকে নীরব থাকতে হতো না আর। খোলা আক াশের নীচে দাঁড়ালে ছাদ উঠে ছাওয়ার ব্যাকুলতা এসে পড়ছে খুব। কিন্তু কোথাও উঠে যাওয়ার মতো তেমন ছাদ নেই। এই উঠতে না পারার ফলে যে অস্বস্তি হয় তা মানুষকে আর্তও করে তোলে কখনো কখনো। গত বছর বৃদ্ধের মুখোমুখি হলে এ বছরের অসুবিধের কথা তো থেকে যাবে অনুপস্থিত স্বাভাবিকভাবেই। অতীতকি কখনো ভবিষ্যতের হয়ে কথা বলতে পারে তেমন করে? এই প্রশ্ন নিয়েও তাকে বিব্রত হতে হয় স্নান করে উঠে নির্বাচিত ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পরেও। তাকেউঠে পড়তেও হয় শেষে। কারণ বাইরেরদরজার বোতামে চাপ পড়েছে। ফলে সমস্ত বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে কোনো পাখির ডাক।

দরজা খুলে যাকে দেখে সে এখনো কৈশোর অতিক্রম করেনি। গৃহমালিকদের কেউ সমুদ্রতীরে বাণিজ্যকর্মের জন্য গিয়েছিল। তাকে নাকি বিশেষ যোগাযোগসূত্রে সেখান থেকেই নিয়ে আসা হয়েছে নির্বিঘ্নে। ঘরের সব কাজকরেও সে ব াইরের হাসি বাঁচিয়ে রাখে সবসময়। নচিকেতার অভিজ্ঞতা অন্তত তেমন কথাই বলে আজ। ছেলেটির হাতে একটা বাটি। বাটির মুখ ঢাকা আছে কলাপাতা দিয়ে। ---কী ব্যাপার? ছেলেটি পুজোর কথা জানাতে গিয়ে তার মাতৃভাষার সঙ্গে নচিকেতার মাতৃভাষাকে মিলিয়ে দেয় হাসতে হাসতে। এমনকী যখন ঝুলনপূর্ণিমার কথা বলে তখনো কোথাও লেগে থাকে সেই যুক্তবর্ণ আনন্দাভ হয়ে। বাটির থেকে পূর্ণিমার পুজোর সিন্নি গ্রহণ করে বাটি খালি করে দিতে হয়। খালি বাটি নিয়ে ছেলেটি চলে গেলে নচিকেতা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, দুপুরে সে আর কিছুখাবে না আজ। কারণ বড়ো বাটির এই সিন্নি খেয়েই তার পেট ভরে যাবে নিশ্চিত। কিছুক্ষণের জন্য তার নিজেকে বেশ দায়িত্বমুক্ত মনে হতে থাকে। প্রচলিত অর্থে মধ্যাহ্নভোজন মানেই তো থালা ধুয়ে গ্লাস জায়গা হাতে রেখে বসা। থালার ভাত পড়বে, ডাল-তরকারি- ভাজা পড়বে, ম াছ বা ডিম পড়বে, চাটনিও পড়তে পারে ক্ষেত্রবিশেষে। তার মানে এক - এক করে সব তুলে ধরতে হবে মুখে। মা থাকতে দৃষ্টি দিয়ে ঘিরে রাখতেন মধ্যাহ্নের থালা। জল খেতে গেলেই ভয় পেতেন। বাধা দিতেন সঙ্গে সঙ্গে। কিছু খাওয়ার আগে কিংবা কিছু খেতে জল খাওয়া মানে খাওয়ার আসল ইচ্ছেটাকেই খেয়ে ফেলা নিঃশব্দে। এখন মধ্যাহ্নের থালায় এসে গেছে স্বাধীনতা। কিন্তু রয়ে গেছে সংস্কার। জল খাওয়ার খুব ইচ্ছে হলেও জল খেতে বাধা আসে ভেতর থেকেই বলে ওঠে--- এখন জল খেলে ভাত - ডাল - তরকারি - ভাজা- মাছ বা ডিম খাওয়ার ইচ্ছেটাই তো আর থাকবে না। জল খেয়ে ভোজনের দফারফা করা চলবে না কিছুতেই। মা চলে গেলেও তাঁর কাজ যে চলছে তা বুঝতে পারে হাড়ে হাড়ে। ত াই খাওয়াটা তার কাছে একটা বেশ দায়িত্বপালনের ব্যাপার আগাগোড়া। ভাত থেকে শু করে মাছ বা ডিম পর্যন্ত যা কিছু আছে সবকিছুকেই লুপ্ত করেদিতে হবে আস্তে আস্তে। তার সামনে আর কিছুই থাকবে না শেষে। থাকবে কেবল থালা ও গ্লাস শূন্য হয়ে আগাগোড়া। থালার শূন্যতা দিয়ে শু আর গ্লাসেরশূন্যতা দিয়ে শেষ। যেদিন এতসব দায়িত্ব আর পালন করতে হয় না, সুযোগ এসে যায় অন্যধরনের, সেদিন সত্যিই একটা বিশেষ দিন। সিন্নিকে অনেকেই সমৃদ্ধ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে খুব। তারা অনেক কিছু দিয়ে এর মধ্যে একটা মহামিলনের ভাব আনতে চায় সত্যি সত্যি। নচিকেতা এসব স্বচক্ষে দেখেছে কয়েকবার। এমনকী পেস্তাবাদামও ডুবে থাকতে চেয়েছে কারো কারো সদিচ্ছায় পুরোপুরি। পূজার সিন্নি কীভাবে সিন্নির পূজোয় পরিণতহয় তা দেখতে দেখতে সে কতবার সপ্রশংস হয়ে পূর্ণ থেকে অংশকেই বেছে নিতে চেয়েছে তার কে ানো হিসেব নেই আর। সে জানে না গৃহমালিকদের মনোভাব। কারণ এই প্রথম কোনো পূর্ণিমার পূজোর অস্তিত্ব সে টের পেল তাদের পটভূমিতে। এই প্রথম কেউ ওপর থেকে নেমে এসে তার হাতে যে - পুজোয় তাকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়নি তার সিন্নির বাটি তুলে দিয়ে আবার ফিরে গেছে ওপরে। সে যখন স্নান করে উঠে ধূপ জ্বালিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল

গিরি নদী আর কান্তারে তখন তার মাথায় ওপরে পূর্ণিমার পূজো চলছিল পুরোদমে।
সে সিন্নি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠেছে এই একটু আগে। এখন চারিদিকে বিকেল পূর্ণবয়স্ক। কিন্তু সে ঘুমের মধ্যে পেয়েছিল আস্ত এক সকালকে। তাই সে জেগে উঠে সময়ের হিসেবে মেলাতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে বেশ। আরো অস্বস্তির ব্যাপার হলো ঘুমের মধ্যে কেবল আস্ত সকালই ছিল না, ছিলেন তারই মর্ম জুড়ে তার পিতা ও মাতা যুগপৎ। আর সবচেয়ে বড়ো কথা সকালের মধ্যেও ঠিক সকালের পরিচ্ছন্নতা ছিল না তেমন। কেমন এক মেঘ বিস্তৃত হয়ে এসে সমস্ত সকালের মাথার ওপরে ধরেছিল ছাতা। ফলে সকালটাকে খুব দূরের কোনো সত্তা বলে মনে হচ্ছিল কখনো কখনো। সেই সকালের মর্মমূলে সে হঠাৎ আবিষ্কার করল দুটি অবয়ব। প্রথমে কিছুই সে চিনে উঠতে পারেনি। কুয়াশা দিয়ে গড়া দুটি মুর্তি, কেবল বোঝা যাচ্ছিল এইটুকু। সে তবু আকুলভাবে অপেক্ষা করতে থাকে।অপেক্ষা করতে করতে সে টের পায় একটি মূর্তি মানবের এবং আর একটি মানবীর নিঃসন্দেহে। যত আকুলতা বাড়ে, কিংবা আকুলতার অপেক্ষা যত রচিত হয়ে থাকে ততই সে চিনে উঠতে পারারক্ষমতা লাভ করতে থেকে একটু একটু করে। একটা সময় আসে যখন পরিষ্কার হয়ে যায় সবকিছু সত্যিই। সে এমনকী খুঁজে পায় মায়ের ডান হাতের জল, ওপরের ঠোঁটের বাম প্রান্তের তিল। বাবার কপালের সেই কাটা দাগ জ্বলজ্বল করে ওঠে আবার। পরিপূর্ণপ্রণাম সেরে মাথা তুলতে গিয়ে বিগ্রহের সিংহাসনের খোঁচায় তাঁর কপালে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয় তার দাগ এত বছর বাদেও অবিকৃত দেখে নচিকেতা আর কথা বলতে পারেনি। শুধু দুচোখ ভরে পিতামাতাকে দেখতে দেখতে সেএক সময় দেখতে পেল কেমন এক অতীন্দ্রিয় বেদনা তাঁদের মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে আছে কিংবা ছড়িয়ে পড়েছে ইতোমধ্যে। আর সেই বেদনাকে ভাষা দিয়ে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে গিয়ে যখন সে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে ঠিক তখন সেই সকালের মধ্যে আরো মুহ্যমান এক সকালের ঢেউ এসে সেই দুটি মূর্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল কোথাও। সেআর কোনোভাবেই তাঁদের কোনো হদিস করতে পারল না। একটু বিহ্বল অবস্থায় সে জেগেছে। কিংবা তাকে বসিয়েদেওয়া হয়েছে এই বিকেলের প্রতিষ্ঠার মধ্যে। বাইরের দিক থেকে যা কোনো - না - কোনোভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তাকে ঘিরেই যে সব কৌতূহল তা আর জানতে বাকি নেই তার। বাইরের এই বিকেলটা নিয়েই লোকে কথা বলবে, বেড়াতে বেরোবে, বড়ো বড়ো সভা করবে, এমনকী ঘোষিত হবে নানারকম ফলাফল। আর ভেতরের সেই সকালটা, যা বর্ণে এবং চরিত্রে আর পাঁচটা সকালের থেকে একেবারে আলাদা, তার প্রতিষ্ঠা নেই বলে তাকে ঠেলে সরিয়ে রাখা হবে এক কোণে, কোনো অবসরের গল্পের পাতায় নির্ঘাত। নচিকেতার কাছে মাঝে মাঝে সবকিছু একাকার হয়ে যাওয়ায় সে ঠিক বুঝতেপারে না কোনটাকে কতখানি মূল্য দিতে হবে। প্রতিষ্ঠিত ব্যাপারগুলোর মধ্যে মাঝে মাঝে সে এতটাই ধস নামতেদেখে, এতটাই বড়ো হয়ে ওঠে ক্লীবতা যে সে খুব একটা আস্থাশীল হতে পারে না আর। তার কেবলই মনেপড়তে থাকে সেই দৃশ্যের কথা যা অনেকবার তার চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন আনন্দদাস্বয়ং। তাঁর মা যখন বেঁচে ছিলেন তখন তাঁর বাবার ওপর দিয়ে যখনই কোনো ঝড় বয়ে যেত তিনি একেবারেই বিচলিত হতেননা।যারা তাদের অনিশ্চয়তার বোধ দিয়ে, বিচক্ষণতা দিয়ে, এমনকী সামাজিকতার বন্ধন দিয়ে, আনন্দদার মাকেতাঁরবাবার সম্পর্কে চিন্তিত করানোর চেষ্টা করত পালা করে চিরকাল, তারা একেবারেই পেরে উঠত না তাঁর সঙ্গে। তিনি সবার সব কথা মন দিয়ে শুনেও তুলে ধরতেন তাঁর ডান হাত পতাকার মতো করে। তাঁর সেই হাতে শোভা পেত বলয় যা শঙ্খনির্মিত এবং শুভ্র সারাক্ষণ। তিনি সেই বলয় দেখিয়ে তাদের বলতেন---আমি এই শাঁখা নিয়ে,শাঁখাসিঁদুর নিয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাব, দেখবেন। পরবর্তী সত্য এই যে, কলেরা এসে একইদিনে আনন্দদার মা ও ভাইকে তিরোহিত করলেও তাঁর বাবার তিরোহিত হতে লেগে যায় আরো প্রায় তিরিশ বছর।
পূর্ণবয়স্ক বিকেলে একবাটি সিন্নি খেয়ে যে ঘুমিয়ে পড়েছিল তার এই জাগরণ খুব নতুন কিছু নয়। এমন তো তার হয়েই থাকে মাঝে মাঝে। নতুন যেটা সেটা একটা তাগিদ। একটা চাপ আসছে ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ার। তখন তত মনে হয়নি, এখন কিন্তু বেজে উঠছে বারংবার ওপরের সেই কিশোরের মাধ্যমে প্রকাশিত শব্দ---ঝুলনপূর্ণিমা। এমন একদিনে চুপ করে ঘরে বসে থাকলে চলবে না। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও একটু দেখে আসতে হবে বাইরেটা। এমন এক মনোভাব যত প্রবল হচ্ছে তত নচিকেতার ভাবনা বাড়ছে ---কোথায় যাবে? যাবে কার কাছে? যাওয়ার জায়গা অনেক আছে, কিন্তু পাওয়ার জায়গা যেন নেই একটাও। যদি কোনো বাড়িকে গন্তব্যস্থল করা হয় তবে সেখানে গিয়ে কিছু সময় কাটানো পর উঠে আসার সময় মনে হবে নির্ঘাত, মনের ঝুলিতে এমন কিছুই পড়েনি যা বহন করে নিয়ে যাওয়া যাবে হাসিমুখে। এই

সমস্যার জন্য কোনো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বোতাম টেপার ইচ্ছেটা প্রায় উবে যাচ্ছে তার মন থেকে। যদি কোনো পথকে গন্তব্যস্থল করা হয় তবে সেখানেও সমস্যার বিরাম নেই কিন্তু। এক একটা পথ দিয়ে যেতে যেতে সেই বিশেষ পথে গিয়ে পড়ার আগ্রহ ধরে রাখা সম্ভব হয় না আর। যে সবপথ দিয়ে বিশেষ পথে পৌঁছোতে হবে সেগুলি এত বেশি প্রয়োজনের স ামগ্রী হয়ে পড়েছে কালক্রমে যে, সেই বিশেষপথে পৌঁছনোর আগেই মন হারিয়ে ফেলে তার বিশেষত্ব। ফলে তার মাধ্যমে কিছু বোঝার উপায়টাই লুপ্ত হয়ে যায় একেবারে। কোনো বাড়িও নয়, কোনো পথও নয়, তবে বেরিয়ে পড়ে শেষে কোথ ায় যাবে নচিকেতা? ---এই চিন্তা করতে করতে সে কোনো বাড়ি বা কোনো পথের চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে জামাক াপড় পরে নেয় অবিলম্বে। সে ঠিক করে নেয় কোনো বাড়ি বা কোনো পথেব দাবি উড়িয়ে দিতে সে এক মন্দিরের হাতছা নিকে প্রশ্রয় দেবে। মন্দিরটি তার বাড়ি থেকে হেঁটে গেলে প্রায় পনেরো মিনিট দূরত্বে অবস্থিত। ওই মন্দির প্রাচীন হলেও একে ঘিরে বছরের এক বিশেষ সময়ে রাসমেলা বসে। ঝুলনপূর্ণিমা সম্পর্কে নচিকেতা তেমন কিছু না জানালেও র াসপূর্ণিমা সম্পর্কেসে সামান্য কিছু জেনে আনন্দ পেয়েছে নিঃসন্দেহে। ঝুলনপূর্ণিমায় সে কিছু কিছু মানুষকে এগিয়ে এসে নানা রঙের মধ্যে দোলনা প্রতিষ্ঠিত করতে দেখছে বহু বছর আগে কোনো কোনো সংসারের পুজোর ঘরে নির্বিবাদে। দাঁ ড়িয়ে দেখতে দেখতে মনে হয়েছে যেখানে রঙের খেলার সঙ্গে কল্পনার খেলা মিলে মিশে গেছে খুব। কিন্তু সে কোনো র াসপূর্ণিমা দাঁড়িয়ে দেখার সুযোগ পায়নি। বরং বসে ভাবার সুযোগ গ্রহণ করে সে টের পেয়েছে তার ব্যাপকত্ব, কিংবা ত ার অপ্রত্যক্ষতা। সে শুনেছে, ঢাকার জন্মাষ্টমী, বৃন্দাবনের দোলযাত্রা, অযোধ্যার ঝুলন আর শান্তিপুরের রাসযাত্রা চোখ দিয়ে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাও কম লাভবান হননি শেষপর্যন্ত। জামাকাপড় পরেও নচিকেতা এগিয়ে যায় তার সামান্য কিছু বইপত্র যে ক্ষেত্রে এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকে সেই ক্ষেত্রের দিকে । খুব বেশি সময় লাগে না সেই বই খুঁজে বের করতে সেখানে রাসোৎসব দেখার অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করা হয়েছে বাংলা ভাষায়। ১২৯৮-এর ৩০ কার্তিকের সন্ধ্যাবেলায় কিছু মানুষ সমবেত হয়েছেন। সেদিন ছিল রবিবার। সন্ধ্যার সময়ে আমরা সকলে, রাসোৎব দেখিতে বাহির হইলাম। ঠ াকুর প্রথমে নিজবাড়ীর প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিতে মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন।সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, শ্য ামসুন্দরের প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দরদর ধারে চক্ষের জল পড়িয়া, ঠাকুরের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। প্রায় ১৫/২০ মিনিট কাল একভাবে অবিশ্রান্ত কান্দিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। একটু স্থির হওয় ার পর, শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিয়া, মন্দির হইতে বাহির হইলেন। বড়রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া আমরা রাসযাত্রা দেখিতে লাগিলাম। বিগ্রহসকলের বহুমূল্য বেশভূষা ও সজ্জার পারিপাট্য দেখিয়া,আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। আহা, ভগবতবুদ্ধিতে আপন ঠাকুরকে এ সকল ঐর্য্যে সাজাইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই ধন্য হইয়া গিয়াছেন। আমি এ সকল বিপুল অর্থব্যয়ের আড়ম্বর দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাইতেছি। নচিকেতা জানে, শতবর্ষ বাদেও বড়ো রাস্তায় দাঁড়ালে বিপুল অর্থব্যয়ের আড়ম্বর চোখে পড়ে, কিন্তু জাগে না বিস্ময়।

এই বিস্ময়ের পটভূমিতে সে ভুলতে পারে না সেই কথকের মুখ যিনি তাঁর দলবল নিয়ে সামান্য অর্থের বিনিময়ে হাজির হতেন যারা উৎসুক তাদের ঘরে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁর দলের কেউ খোলা বাজাত, কেউ করতাল কেউ শুধু কণ্ঠ মেলাত প্রধান কণ্ঠের সঙ্গে। খুব সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আসতেন কথকঠাকুর। গলায় মালা পরেই তিনি তাঁর কথা বলে যেতেন এবং গাইতেন যথাসময়ে। তাঁর কথা এবং তাঁর গানের মধ্যে এমন এক সামঞ্জস্য ছিল যা এত বছর বাদেও ভোলা কঠিন। নচিকেতা তাঁর খুব সামনে বসে শুনেছে, এই রাসনৃত্যকে তিনি বলতে চেয়েছিলেন চিন্ময়। এ কথাও তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন জোর দিয়ে যে, গোপিকাদের স্বামীরা জানতেন তাঁদের পাশেই শুয়ে আছেন তাঁদের প্রত্যেকের স্ত্রী। একদিক থেকে তাঁদের এই জানার মধ্যে ভুল নেই কোনো। প্রত্যেক গোপিকার জড়দেহ ছিল তাঁদের প্রত্যেকের শয্যায়। তাঁদের প্রত্যেকের চিন্ময় শরীর কিন্তু চলে গিয়েছিল কৃষ্ণের কাছে তাঁর সঙ্গে নৃত্যে যোগ দেওয়ার জন্য। এই জড় ও চিন্ময়ের প্রভেদ না বুঝতে পারলে সমস্ত ব্যাপারটাই যে হয়ে দাঁড়াবে রিপুর বিস্ফোরণ সে ব্যাপারে তিনি সাবধান করে দিতেন ব ারংবার। তাঁকে সাহায্য করত তাঁর অনুভবের শিক্ষা, তাঁর সতীর্থদের দীক্ষা এবং তাঁর শ্রোতাদের তিতিক্ষা। রাসনৃত্যের এখনো দেরি আছে কয়েকমাস। তবু সে রাসনৃত্যের কথা ভেবে ঝুলন পূর্ণিমার বিকেলে বেরিয়ে পড়ে যেখানে রাসমেলা হয় সেখানে আজ কী হচ্ছে তা দেখার জন্য।

লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি এসেও সে বাধা পায়। খুব পরিচিত কণ্ঠস্বরের ডাকে তাকে দাঁড়িয়ে পড়ে তাকাতে হয় পেছনে। যার

হাতে একদিন ময়দার তাল ছিল সে ডাকছে সামান্য হেসে। নচিকেতা পিছিয়ে এসে তার মুখোমুখি হয়। ---কোথায় য াচ্ছেন? অনেকদিন আপনাকে দেখতে পাইনি। আজকাল বোধহয় এদিকে আর আসেনই না। কোথায় যাচ্ছেন? যার কাছ থেকে উত্তর চাওয়া হচ্ছে তার কাছে সবসময় যে উত্তর থাকে তা বলা যাবে না কিছুতেই। ---যাচ্ছি যেখানে রাসমেলা হয় সেখানে। ---এমন উত্তর নচিকেতার একেবারেই পছন্দ নয় বলে সে একটু সময় নেয় ভাবতে। ---এই একটু হাঁটতে বেরিয়েছি। ---এমন কিছু বললেও বড়ো বেশি দায়সারা কথা হয়ে যায়। যে তার কাছে উত্তর চেয়েছে সে তাকেই চেয়েছে অনেক বেশি করে। ফলে সে আর কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে তার হাত স্পর্শকরে। ---কতদিন আপনাকে দেখিনি। আমার দোকানে একটু বসতে কি খুব অসুবিধে হবে? যদি খুব অসুবিধে না হয় একটু বসে যাবেন, চলুন না। নচিকেতা একবার ভাবে এই আমন্ত্রণের প্রলোভনে না পড়ে যেমন এগিয়ে যাচ্ছিল এগিয়ে যেতে থাকবে তেমন। কারণ সে চলে এসেছে লক্ষের খুব কাছে। আর দু-একটা রাস্তা পার হলেই সামনে পড়বে সেই মাঠ যেখানে আজও প্রতিবছব যথাসময়ে রাসমেলা বসে। দূরের মানুষের রচনার দিকে কাছের মানুষের হাতভালো করে ধরে তাকায় মানুষ। সে মায়ের হাত ধরে এই মেলায় এসে দেখেছে যে - রচয়িতাকে কেউ কেউ সারা জীবন ধরে সমস্ত কিছু ছেড়ে খুঁজে বেড়ায় তার এক - একটা রচনা, কখনো বিক্রয়যোগ্য গাছপালার মধ্যে, কখনো বা খাঁচার ভিতরকার অস্তিত্বের বর্ণবিন্যাসে। মা তার হাতে তুলেদিয়েছিলেন এমন এক শিশুকে যে মৃণ্ময় আর নীল । তার চোখেমুখে দুষ্টুমির হাসি। মাঝে মাঝে তার মুখে সন্দেশের স্পর্শ লাগলে মনে হতো সে ভালোবাসার দান গ্রহণ করেছে। মাঝে মাঝে মাকেও বলা যায় না এমন কোনো কষ্ট পেলে ত ার সামনে বসে তাকে বলা যেত স্বচ্ছন্দে, কোনোরকম বাধা ছাড়াই। বেশ মনে হতো তার মতো নীরব শ্রোতা সে আর দেখেনি তার জীবনে। কী করে যে নিজের সামান্য ভুলে সেই নীল আর মৃন্ময় শিশু তার হাত থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে দু-টুকরো হয়ে যায় তা আর বুঝতে পারে না আজ। তবে রাসমেলাসূত্রে যে প্রাপ্তি তার অভিজ্ঞতা থেকেই তার বুঝতে যেন সুবিধে হয়ে গিয়েছিল কথকঠাকুরের মাল্যবান হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে সব উচচারণ সেগুলির মধ্যে কী আছে কেমন করে আনন্দ আর বেদনার অক্ষয়সূত্রে। ---এত কী ভাবছেন ? আর ভাবতে হবে না। আমার দোকানে একটু আসুন। চলমানত ার মধ্যে থেকে কেউ যদি তাকে হঠাৎ আলাদা করে সরিয়ে দেয় কী আর করতে পারে সে। ফলে নচিকেতা সেই দোকানের চেয়ারে গিয়ে বসে যেখান থেকে পরিষ্কার দেখা য়ায় যার দোকান তার বাসস্থানের বারান্দা এবং জানলার পর জানলা। সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নচিকেতা তার মেয়ের কথা তোলে। কারণ তার যখন এ পথে আসা হবে না ততই তো ধীরে ধীরেবাড়তে থাকবে মেয়েদের বয়স। মেয়েদের বাবা সামান্য মুখ তুলে প্রকাশ করে মেয়ে কতটা বড়ো হয়েছে সেই সংবাদ। যে বালিকা ছিল সে কালক্রমে কিশোরী হয়েছে। ফলে সে আর রঙ মেখে ভূত হয়ে বসে থাকে না। যতটা সম্ভব ক াজে লাগায় রঙ। কখনো কখনো রঙের বাক্স সরিয়ে রেখে বিনা রঙেই যে কাজ সারে তা প্রকাশ করতে গিয়ে মেয়ের বাব ার মুখেও সামান্য সময়ের জন্য যে হাসি জন্ম নেয় তা কিন্তু পুরোপুরি রঙিন। ছবি আঁকার জন্য সে কেবল ঘরকেই ব্যবহ ার করে না, পরকেও যে ব্যবহার করে তা সামান্য উপকরণ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয় নচিকেতার কাছে।ছুটির দিনে মেয়ে ম াকে সঙ্গে নিয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ট্রেনে চেপে নেমে পড়ে যে কোনো স্টেশনে। কোথায় কী যে কখন তার চোখে পড়ে যাবে তা কেউ বলতে পারে না। ---এই তো সেদিন মার সঙ্গে সারাদিন মাঠে বসে থেকে একটা গাছ এঁকে এনেছে। টুম্পা এখন বাড়ি নেই। থাকলে ছবিটা আপনাকে দেখাতাম। নচিকেতা ভাবে, আবার কবে সে এ পথ দিয়ে যেতে যেতে আমন্ত্রণেব দ্বার া গতিপথ পরিবর্তন করে এ দোকানে এসে দোকানের মালিকের বাড়ির দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে পারবে ঠিক এরকমভ াবে তা কে বলতে পারে। ---আপনি একটু বসুন দাদা আমি চট করে বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি। গোবিন্দ আজ দোকান খোলেনি। না খুলুক, আজ আপনাকে একটু আমার বাড়ির চা খেতে হবে। নচিকেতা যথারীতি বাধা দেয়। কিন্তু সে বাধা টেকে না, হেরে যায় গূঢ় আবেগের কাছে। সে চলে গেলে যে বসে থাকে তার কিছুই করার থাকে না বলে সে এতদূর ভ াবতে পারে যে, একদিন চলতে চলতে কোনো পথের মোড়ে অথবা কোনো রথের দরজায় ইভার সঙ্গে টুম্পার দেখা হয়ে য াবে ঠিক। শেষে পরিচয়ও হয়ে যাবে কোনোএক মূহূর্তে । ইভা হয়তো ততদিন বুঝতে পারবে, সে যা লিখতে চাইছে তার মধ্যে ছবির ভাব না আনতে পারলে আনা যাবে না কিছুই। টুম্পার ও হয়তো সেই বোধ আসবে যার সহযোগিতায় যা প্রত্যক্ষের ডালপালা তার আলোয় সে ঠিক বের করে আনবে পরোক্ষের নবপত্র। যেন শু হয়ে যাবে একটা লাবণ্যময় আদ ানপ্রদান, একটা দেওয়ানেওয়ার পালা অষ্টপ্রহর। ইভা হয়তো কোনোদিন হাসতে হাসতে বলে ফেলবে, আমি ছাদের খেঁ

াজ এনে দেব। আকাশদীপ আঁকার দায়িত্ব কিন্তু তোমার। টুম্পা হয়তো বাধা দেবে। ---ছাদের খোঁজ করার সময় তোমার সঙ্গে আমিও থাকব কিন্তু। আর আমি যখন আকাশদীপ আঁকব আমার পাশে তুমি না থাকলে কে থাকবে আর? এই জিজ্ঞাসা কোনোদিন হয়তো পথে কিংবা রথে উত্তোলিত হবে। তবে সেদিন নচিকেতা থাকবে কিনা সন্দেহ আছে। সে সামনের টেবিলের ওপর হাত রেখে ভাবে অনাগত সময়ের কথা।

যার চা নিয়ে আসার কথা সে ফিরে এসেছে অবশেষে। তার হাতে ফ্লাস্ক। দোকানের আলমারি থেকে কাপডিশ বের করে ভালো করে ধোয়ার পর ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালা হয় কাপে এবং ডিশে তুলে দেওয়া হয় দুটো সন্দেশ। ---এই সন্দেশদুটো খেতে হবে কিন্তু। আজ পূর্ণিমার পূজো হয়েছে বাড়িতে। তারই সন্দেশ। নচিকেতা একটু দ্বিধায় পড়ে। সন্দেশকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। কিন্তু তাতে আবার সমস্যার সৃষ্টি হয়। সন্দেশ খেয়ে চা খেলে চা আর মিষ্টি লাগে না তত। কিন্তু চা খেয়ে সন্দেশ মুখে দিলে সন্দেশের স্বাদ হ্রাস পায় না মোটেই। শেষপর্যন্ত সে চায়ের কাপ তুলে নেয় সন্দেশ পাশে রেখে। নচিকেতা যার দোকান তার বাবার টাঙানো ছবির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে তিনি আজ আর একা নন। তাঁর ঠিক পাশেই সমানভাবে মাল্যবান হয়ে শোভা পাচ্ছেন এক নারী। বুঝতে অসুবিধে হয় না। তবু তার প্রশ্ন বেরিয়ে আসে। --এই ছবি তো মায়ের? হ্যাঁ, আমার মা। বাবা চলে যাওয়ার পর অনেকদিন ছিলেন।কিন্তু আর ধরে রাখতে পারলাম না। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। আসল রোগটাই কেউ ধরতে পারল না। আমার মায়ের দুটো পা একেঁছে আমার মেয়ে। রঙ দিয়ে আঁকেনি, পেনসিল দিয়ে এঁকেছে। ও বাড়ি থাকলে দেখিয়ে দিতাম। যত সময় যায় তত দোকানের মালিকের চেয়ারে বসে বুঝতে পারে নচিকেতা, চতুর্দিক থেকে ধীরে ধীরে কমে আসছে দেখিয়ে দেওয়ার ভূমিকা। ববং বেড়ে চলেছে দেখার ভূমিকা একটু একটু করে। সে দেখতে পায় বিকেল সন্ধ্যাকে এবং সন্ধ্যা রাত্রিকে বেছে নিচ্ছে নিজেকে বিলুপ্ত করার মাধ্যম হিসেবে। দেকানের মালিক তার আসনে না বসেও কারো কারো সঙ্গে কথা বলতে থাকে আসন্ন কোনো অনুষ্ঠানের খাদ্যতালিকা নিয়ে। সে বসে বসেই বুঝতে পারে যাদেরবসিয়ে খাওয়ানো হয় তাদের খাদ্যতালিকা কত বদলে গেছে নিঃশব্দে। মাছ ও মাংসের কত ক্ষমতাবান তথা প্রভাবশালী উপস্থিতির ফলে কোথায় তলিয়ে গেছে সেইসব শাকভাজা, বেগুনভাজার সেইসব লম্বা লম্বা আয়তন। কলাপাতার এক কোণে গুত্ব পাওয়া নুন আর লেবুর টুকরো গুত্বহীন হয়ে মুখ লুকিয়েছে নচিকেতার মতো কারো কারোমনের মণিকোঠায়। এক চিলতে কষ্ট আস্তে আস্তে মাথা তোলার চেষ্টা চালিয়ে যায় সুযোগ পেলেই। এমনকী লুচিরসেইসব লুপ্ত উদয়নের কথাও তার মনে পড়ে যায়। সে যখন এই প্রকাশের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাবে, থাকবে না এই পৃথিবীতে আর, তখন তাকে ঘিরে কোথাও যদি কোনো স্মরণানুষ্ঠান হয় কখনো তবে সেখানে থাকে ধোয়া কলাপাতারএক কোণ জুড়ে লেবু আর নুন, আর তার মাঝখানে শাকভাজা, বেগুনভাজা এবং লুচির পরিপূর্ণতা লাবণ্যযে াজনা হয়ে --এমন এক কামনা, কিংবা এমন এক অভিমান কেন্দ্রবিন্দুর আকারে যেন ফুটে উঠতে থাকে এই দোকানেরইকে াথাও সকলের অগোচরে নিশ্চিত। সে বুঝতে পারে এবার তার ওঠার সময় হয়েছে, সময় হয়েছে আসনত্যাগের। যেতাকে ডেকে এনেছিল সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে তার কাছ থেকে বিদায় নিতে সামান্য সময় লাগে নচিকেতার।

এখন সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময় ও ইচ্ছে চলে গেছে দুটোই। না হলে এই সামান্য রাতে আর একটু হেঁটে গেলেই সেই মেলার মাঠ পড়ত। মাঠের পাশের মন্দিরে গিয়ে দেখে নেওয়া যেত সহজেই যেখানে রাস আসে সেখানেঝুলন এসেছে কিনা। সে পিছিয়ে যায়। পিছিয়ে যেতে যেতে টের পায় রাতের বাজার বসেছে আঞ্চলিকতার সমস্ত উপসর্গ ধারণ করে। পাঞ্জাবি ও লুঙি পরে যিনি আলোর সামনে ঝুঁকে পড়ে কুমড়োর ফালি দর করছেন তাঁকে অনেকদিন থেকে চেনে সে। অবসর নেওয়ার পরে অন্তত কুড়ি বছর ধরে তিনি পেনশন পাচ্ছেন। অতীতে তিনি এমন কিছু মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছেন যাঁরা অনেকের কথা ভেবে সঙঘবদ্ধ করতে চেয়েছেন অনেককে এবং তাঁদের সেই প্রচেষ্টাকখনো কখনো বিপুল সার্থকতায় পৌঁছে আশা জাগিয়েছে মানুষের মনে। বর্তমানে তিনি এমন কিছু মানুষকে প্রত্যক্ষকরছেন যাঁরা নিজেদের কথা ভেবে সঙঘধ করতে চেয়েছেন অনেককে এবং তাঁদের সেই অভিসন্ধি বিপুল সার্থকতায় পৌঁছে মানুষের মন জাগিয়ে চলেছে আলোয়। এত বৈপরীত্যের এতবড়ো সাক্ষী হতে পেরেও তিনি দুবেলা বাজারে আসার সুযোগ হাতছাড়া করেন না কখনো। তিনি এখনো সকালবেলায় আলুর দোকানের সামনে বসে দোকানদারের কাছ থেকে চুপড়ি চেয়ে নিয়ে যেগুলি বিনষ্ট হয়নি সেগুলিকে যে আলাদা করেন পরমোৎসাহে সে কথা নচিকেতা তাঁরই মুখ থেকে শুনেছে কখনো। তিনি তাঁদের পাড়ায় থাকলেও পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ছে তাঁর কোনোকষ্ট হয় না। যে টা নির্ভেজালভাবে হয় সেটা হলো পায়ে হাঁটা। --

একটা কথা তো তুমি স্বীকার করবে নচি, যত ছড়িয়ে পড়ি তত হাঁটাটা হয়ে যায় মুফতে। হ্যাঁ, জোরগলায় বলি, মুফতে। মনে রাখবে, হাঁটার জন্য এখনো কোনো পরিষেবা - কর চালু হয়নি কিন্তু। এ কথা শেষ করে নিজস্ব দাঁত বের করে হেসে উঠেছেন নিজেই। নচিকেতা এখনো এমন সব হাসির মধ্যেই খুঁজে পায় প্রকৃত স্বাধীনতার প্রকৃত অভিজ্ঞান। সে স্বাধীনভাবে হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ বুঝতে পারে এমন এক গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে হঠাৎ যেখানে এমন এমন জায়গা আছে যেগুলো খুব কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে একটু বৃষ্টি হলে। এই গলিতে জল জমে থাকে না, কিন্তু কাদা জমে থাকে গভীরভাবে। এই গলি ধরে সোজা এগিয়েগেলে বাসরাস্তায় পৌঁছে যায় যায় একসময়। এই গলির ডাইনেবাঁয়ে আরো অনেক গলি গলাগলি করে বেঁচে আছে বহুকাল। যতদূর জানা যায়, অনুমান করা যায় যতদূর, শ্রীধরতাড়িত সীমা এখানে এমনই এক গলির আশ্রয়ে কাটিয়ে যেত কয়েকদিন। নচিকেতা অবিমিশ্র পদাতিক হয়ে গলির ভেতর দিয়ে যতই গলে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে তত তার কষ্ট বাড়ে নিঃসন্দেহ। কেবল অন্ধকার হলে অসুবিধে তত মারাত্মক হয় না। একটা মাপ নিয়ে, মননের সাহায্য নিয়েও খানিকটা, এগিয়ে যাওয়া যায় সামনের দিকে কোনো-না- কোনোভাবে। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে আলোর ভেজাল থাকলে কোথায় কতটা পা ফেলা দরকার সেই হিসাবের মধ্যেও বারবারই এসে পড়তে থাকে গরমিল। ফলেযত সে এগোয় তত তাকে দিয়ে যেতে হয় গুনাগার যেন। বাসরাস্তার সামনে এসে সে বুঝতে পারে কেন এত চাহিদাউজ্জ্বলতার চিরকালই। চারপাশটা যতই আলোকের বৃত্তকণিকায় পূর্ণ হয়ে উঠছে ততই তার চোখের সামনে প্রকাশ পাচ্ছে সাদা সাদা দুটি সন্দেশ। পূর্ণিমার পুজোতে নিবেদিত ওই দুটি বাস্তবতা বাদ পড়ে গেছে তার জীবন থেকে।

চা খেয়ে পরে সন্দেশ খাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেও শেষপর্যন্ত একেবারেই ভুলে গেছে সন্দেশের কথা। দোকানের মালিক ব্যস্ত হয়ে পড়ায় সেও সেই ভুল ধরিয়ে দেওয়ার সুযোগ লাভ করেনি। একবার ফিরে যাওয়ার কথা ভাবে। ভাবে ফিরে গিয়ে খালি করে দিয়ে আসবে ডিশ। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের যে পথ তার প্রকৃতির কথা ভেবে তার আর সাহস হয় না ফিরে যাওয়ার। সে খুব কাছের একটা মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে যে দুটো মিষ্টি ফেলে এসেছে ঠিক সেরকম দুটো মিষ্টির খোঁজ পেয়ে গেলে খরিদ্দার হয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। সভ্যতার সামনে দাঁড়িয়েই সে ঠিক করে ফেলে, আজ রাতে শোওয়ার আগে এক গ্লাস দুধ আর দুটো মিষ্টিই হবে তার রাতের পথ্য।

বাসরাস্তার কাছে দাঁড়ালেও সময় কেটে যায় কখনো কখনো। সে এমন একটা ছাউনি বেছে নেয় যেখানে দাঁড়ালে বাসগুলোর চলাচল যেমন চোখে পড়বে পরিষ্কার, তেমন বৃষ্টি এসে পড়লেও কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারবে না তেমন করে। শহরে নতুন নতুন পথ এসে নতুন নতুন পথের মুখোমুখি হতে পেরেছে কতটা তা নিয়ে উদ্দীপক কোনো মনোভাব সে টের না পেলেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে একটা ভালো করেই বুঝতে পারে যে, একটা সত্য ধুলো ঝেড়ে দাঁড়িয়ে পড়তে চাইছে এতদিনে। নতুন নতুন বাস এসে যোগাযোগের নতুন নতুন সম্ভাবনা প্রকট করতে চাইছে বারংবার। আগে তার মাসির বাড়ি যেতে গেলে মাকে নিয়ে তাকে অন্তত দুবার বাস বদল করেও হাঁটতে হয়েছে বেশ খানিকটা। কিন্তু ছাউনির তলায় স্থির হয়ে সে টের পায়, এমন বাস এসে গেছে যাতে উঠলে মাসির বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে যেতে আর কোনো কষ্ট হবে না। যে বাসের পরিচালক সে নয়, তার সহযোগী বাস থেকে নেমে মাসির বাড়ি যে মোড়টির সামনে তার নাম করছিল চেঁচিয়ে কিছুক্ষণ আগে। নচিকেতা এই বাসের কথা আগেই শুনেছিল, আজ দেখল স্বচক্ষে। এই বাস চালু হওয়ার পর পার হয়ে গেছে অন্তত আঠারো মাস। এই আঠারো মাসে একবারও সে এই বাসের যাত্রী হওয়ার কথা ভাবেনি তেমন করে। মাসি কিন্তু এখনো বেঁচে আছেন। এখনো বিকেলবেলায় তাঁকে বারান্দায় বসিয়ে দিলে তিনি একা একাই সেই পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেন যে পথ মোড়ের মাথায় গিয়ে শেষ হলেও স্মৃতির পথটাকে বাড়িয়ে চলেছে ক্রমাগত। মাকে নিয়ে মাসির সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মাসি মাকে জড়িয়ে ধরে বলতেন --তোর সময় হলো! মাও বলে উঠতেন প্রত্যালিঙ্গন করে -- তোর কত সময় হয়েছে, তাই না রে? নচিকেতার সামনে দিয়ে বিভিন্ন সময়ে কত বাস চলতে যাচ্ছে। একই পথের একাধিক বাসের মধ্যেও ঢুকে পড়েছে সময়ের সব আমিষাশী প্রতিযোগিতা। কিন্তু মা ও মাসির যুগলবন্দনায় সময়ের সেই যে সুর তা হারিয়ে গেছেএবং হারিয়ে যাচ্ছে রোজ। নচিকেতা জানে তার এত ক্ষমতা নেই যার জোরে তারই খোঁজে বেরিয়ে পড়া যেতে পারে একা একা যেখানে - সেখানে। সে মাঝে মাঝে পয়সা দিয়ে একটা আবদ্ধ খোপের ভেতর ঢুকে গিয়ে কয়েকটি সংখ্যা টিপে পৌঁছে যায় মাসির বাড়ির বাইরের ঘরে। সাধারণত মাসির পুত্রবধূ এগিয়ে আসে।

---হ্যাঁ, কে বলছেন আপনি? কখনো কখনো প্রশ্নের ভেতর থেকে ঝরে যায় আপনি এই সর্বনাম। তখন আরো মুশকিলে

পড়ে যায় সে। আমি নচিকেতা ---এমন কথা বলতে গিয়েও তার জিব অটাকে যায়। কারণ মাসির পুত্রবধূ তার থেকে বয়সে ছোটো হলেও বড়ো কলেজেই দর্শন পড়ায় কেবল, বাড়িতে পড়ায় না কাউকে কখনো। তাকে সময় নিয়ে সরব হতে হয়। --- আমি নচি বলছি। মাসি ভালো আছেন তো?

যে সেতুর ওপর দিয়ে কেবল যায় রেলগাড়ি তার নীচ দিয়ে যায় রেলগাড়ি ছাড়া আর সমস্তরকমের যান। যে রাজপথের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি ছাড়া আর সমস্তরকমের যান চলাচল করে তার ঠিক তলা দিয়েও যাতায়াত করে কেবলমাত্র রেলগাড়িই। নচিকেতা মনে রেখেছে তাদের যৌবনের বছরের পর বছর কীভাবে প্রত্যক্ষ করেছে পাতালের সেই প্রস্তুত হয়ে ওঠা। যাদের বাড়ির কাছ দিয়ে পাতালের সিঁড়ি নেমে গেছে তারা ভুলতে পারবে ধোঁয়া, ধুলোআর শব্দের সেই তাড়না স্নায়ুর ওপর আঘাত হানতে হানতে কীভাবে পার করেছে একটা বড়ো সময় যা আদতে ছিল তাদের জীবনের সবচেয়ে সচল সবচেয়ে রাতুল সব দিনগুলির সমবায়? সেতুর তলা দিয়ে যেতে যেতে সেইসব তাপিত দিনের নির্যাস তার হাতে উঠে আসে এত বছর পর। সেই নির্যাস মুখে, মাথায়, গায়ে মাখতে মাখতে সে হাঁটছিল বলে প্রথমে খেয়াল করেনি। পরে বুঝতে পারে তার পা জড়িয়ে ধরতে চাইছে কেউ। তার চেহারা এতটাই অস্পষ্ট যে সে নারী না পুষ তা নিয়ে চট করে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে কষ্ট হয় বেশ। তার ভাষা এতটাই জড়ানো যে সে বাঙালি না অবাঙালি তা নির্ণয় করাও কঠিন হয়ে পড়ে আজ। সেটা খুব সহজেই বোঝা যায় সেটা হলো আকুলতা। সে পা জড়িয়ে ধরে আকুলভাবে চাইছে কিছু সাহায্য। তার হাত পথিকের পা থেকে মুহূর্তের মধ্যে তার নিজেরমুখের কাছে উঠে গিয়ে আবার নেমে আসছে পথিকের পায়ে। তার ভাষা ব্যর্থ হলেও তার মুদ্রাই বলে দিচ্ছে তার ক্ষুধার্তি। কেউ আকুলভাবে পা জড়িয়ে ধরলে যে কাজ হয় সেই শিক্ষা মনুষ্যেতর প্রাণীকেও যে দেওয়া হয়েছে সার্থকভাবে তার প্রমাণ পেয়েছে কোনো এক পাড়ার কোনো এক গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নচিকেতা যে ডুগডুগি বাজিয়েবাঁদরের নানাখেলা দেখাচ্ছিল সে খেলা শেষ হলে বাঁদরকে শুনিয়ে বলে--- যা। বাবুর পা জড়িয়ে ধরে খেতে চা।বাবুর দয়ার শরীর। বাবু পয়সা দেবে। যা, পা জড়িয়ে ধর। নচিকেতা স্বচক্ষে দেখেছে মালিকের নির্দেশ পাওয়ার পর বাঁদর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে এগিয়ে গিয়ে কোনো এক বাবুর পা জড়িয়ে ধরে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। ফলে বাবুর পক্ষে আর স্থির থাকা সম্ভব হয়নি। বাবু হাসতে হাসতে তার পকেট থেকে বের করে দিয়েছে মুদ্রা।সেই সফলতার সমর্থনে বেজে উঠেছে নতুন করে ডুগডুগি। বাঁদর পা ছেড়ে এগিয়ে গেছে নতুন পায়ের দিকে। নচিকেতা আর দাঁড়াতে পারেনি সেখানে। সে স্থানত্যাগ করেছে দ্রুত অব্যবহৃত পায়ের সাহায্যে নিশ্চিত। কিন্তু এই সেতুর তলায় দাঁড়িয়ে তার নিজেকে খুব অসহায় মনে হতে থাকে। তার মাথার ওপর দিয়ে চলে যায় রেলগাড়ি এবং তার বিপুল শব্দ ও ভার। তার পাঁচ হাত দূর দিয়ে বয়ে যায় সবচেয়ে রূপসি গাড়ির সবচেয়ে দামি দেহ। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার ঠিক নীচেই অনুমান করা যায় মানুষ সবচেয়ে কম সময়ে তার গন্তব্যে পৌঁছোনোর জন্য অপেক্ষা করে আছে। তার সেই সামান্য সময়ের অপেক্ষাকে সহনীয় করে তুলতে কয়েক হাত অন্তর অন্তর বাক্স ঝুলিয়ে রঙিন ছবি দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি তল কিংবা প্রতিটি স্তর খুবই পরিষ্কার নচিকেতার কাছে। সব জায়গাতেই কাজ করছে বেশ একটা যুক্তি, বেশ একটা শৃঙ্খলা আগাগোড়া। বুঝতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না, ধরতেও অসুবিধে হচ্ছে না কোনো। একটা প্রবন্ধ লিখতে যত উপকরণের দরকার হয়, একটা পাঠচক্র পরিচালনা করতে যতসপ্রতিভতা প্রয়োজন হয়ে পড়ে সবই বিরাজ করছে ওপরে, নীচে বা মাঝখানে নির্ঘাত। কিন্তু মুশকিল হয়ে গেছে এই প্রাণীটিকে নিয়ে যার লিঙ্গ অস্পষ্ট, ভাষা অবোধ্য, বয়স অজ্ঞাত, কেবল মুদ্রা আন্তর্জাতিক এবং অব্যর্থ সারাক্ষণ।আরো মুশকিল হয়ে যায় যখন নচিকেতা অনুভব করে তার পা ভিজে যাচ্ছে অশ্রুতে। সে কী করবে সে ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। যে পা জড়িয়ে ধরছে, যে অশ্রুপাত করছে তার পায়ের ওপর এমনকী, তার সচলতার সঙ্গে অসম যুদ্ধ চলতে থাকে নচিকেতার অচলতার। বলাবাহুল্য এই যুদ্ধের আয়ু খুবই বেশি হবে কেউ তা আশা করেনি। নচিকেতা নিজেই কিছুক্ষণ বাদে সরে যায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। যে পা জড়িয়ে ধরেছে তার হাতে দুটি সন্দেশ তুলে দিয়ে সে অবশেষে সরে যাওয়ার সুযোগ পায়।

বাড়ি ফিরে বসতে না বসতেই যে ছেলেটি আজ বেলার দিকে একবাটি সিন্নি দিয়ে গিয়েছিল সেই ছেলেটির মুখমণ্ডল প্রকাশ পায় অকস্মাৎ। সে সদর দরজায় করাঘাত করে ভেতরে ঢোকার সুযোগ খোঁজেনি। চাইছে জানালা বেয়ে উঠে কাজ সারতে বাইরে থেকেই। তার হাতে একটা চিঠি চিঠিটা ডাককর্মী গৃহমালিকদের বাক্সে ফেলেদিয়ে চলে যায়। এমন হয় কখনো কখনো। তার চিঠি তার কাছে আসে একটু ঘুরপথে। নচিকেতা বুঝতে পারে না কে তাকে শেষে খামে চিঠি দিল।

ছেলেটির হাত থেকে চিঠি নিয়ে হাতের লেখা দেখে খাম ছেঁড়ার আগে সে কিছু অনুমানকরতে পারেনি। খাম ছেঁড়ার পর ভেসে ওঠে আনন্দদার মুখ। আনন্দদা গঙ্গার তীরে বসে তাকে চিঠি লিখেছেন। আনন্দদা তাঁর ঘর ছেড়ে রাত্রিবাস করতে চায় না কোথাও। যারা বাইরে থাকে, যাদের থাকার জায়গাটা প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ঋদ্ধ তারও অনেকবার অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে কয়েকদিনের জন্য তাদের কাছে আনতে পারেনি। তাঁর মামার কথা আনন্দদা নিজেই বলেছেন নচিকেতাকে। তাঁর এই ছোটোমামা জীবনের একটা বিশেষ, সময় পর্যন্তঅত্যন্ত এলোমেলো এবং অকৃতকার্য ছিলেন। তিনি যে আদৌ জীবনে কিছু করতে পারবেন তা তাঁর কোনো শুভার্থীই ভাবতে পারেননি একসময়। সেই ছোটোমামার বিয়ে হলো। আর কী আশ্চর্য সেই বিয়ের পর থেকেই তাঁর ভাগ্য খুলতে শু করল একটু একটু করে। ---নচিবাবু, এখন এসব কথা বলতে গেলে অবান্তর মনে হবে। মানুষ ছুটছে। তার তো সময় নেই এসব বাজে কথা শোনার। আমি যা দেখেছি তা আমার কাছেই থাক। স্ত্রীভাগ্যে ধন--এই কথাটা আমার ছোটোমামার ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। বিয়ের পর কী যে হলো, মামা যে ব্যবসাতেই হাত দেন তাতেই সোনা ফলে। এখনকার কোটিপতি নয়, তিনি তখনকার দিনে কোটিপতি হয়েছিলেন। আনন্দদার সেই ছোটোমামা এবং তাঁর স্ত্রী ভাগ্নেকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সারাজীবনে একবারই আনন্দদাকে তাঁদের কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যেতেসক্ষম হয়েছিলেন। তারপর কত ডাক এসেছে, এমনকী মিনতির পর্যায়ে চলে গেছে কোনো কোনো ডাক, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে নড়ানো সম্ভব হয়নি। তাঁদের মৃত্যু হয়েছে যথাসময়ে। এখন সেই পাহাড় আর ঝর্নার কোলে তাঁদের পুত্রকন্যাদের রাজত্ব। তারা রাজত্ব পেয়ে তাদের অগ্রজকে ভুলে যায়নি। তারও বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করে তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গেছে বেশ কয়েকবার। এখন তারা হতোদ্যম। তবে মাঝে মাঝে তাদের সাদামাটা চিঠি যে আসে এখনো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আনন্দদা তাঁর কর্মজীবনের একেবারে প্রথম দিকে কোনো আন্দোলনকে রূপ দিতে গিয়ে কর্মক্ষেত্রের সামনেই রাত্রিবাস করেছেন। সেই রাত্রিবাসপর্বে বালিশ মাথায় না দিয়ে যেমন ইট মাথায় দিয়েছেন অকাতরে তেমন অভিভূত হননি পরবর্তীকালে দুগ্ধফেননিভ শয্যা পেয়ে। তাঁর বাবা অনাথবন্ধুর কাছে সংস্কৃত শিখতে আসতেন বিচারপতিচৌধুরী। অনাথবন্ধু চলে গেলে তিনি আনন্দদার কাছেও আসতে শু করেন। তবে কিছু শিখতে নয়, কিছু অনুভব করতে। এই বিচারপতি পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী এক প্রদেশের প্রধান বিচারপতি হয়ে খুব চেয়েছিলেন আনন্দদা একবার তাঁর কাছে আসুন। আনন্দদা কিন্তু তাঁর এই পিতৃবন্ধুর ডাক ফেরাতে পারেননি। প্রধান বিচারপতির কাছে তিনি পৌঁছোলে তাঁকে তোপধবনি দিয়ে বরণ করা হয়। ---জানেন নচিবাবু, আমি চৌধুরীকাকার কান্ডকারখানা দেখে অবাকহয়ে গিয়েছিলাম। তিনি এই খাটের ওপর শীতের রোদ্দুরে বাবার কাছে বসে শকুন্তলা পড়েছেন। তিনি যেখানে আটকে যাচ্ছেন হাতে একটি নস্যি নিয়ে বাবা ঝাঁপিয়ে পড়ছেন সেখানে। কিংবা মেঘদূত পড়তে পড়তে উজ্জয়িনীর রাজপথে থমকে গেছেন চৌধুরীকাকা। অন্ধকার সূচীভেদ্য। এক গুচ্ছ অভিসারিকা তাদের দয়িতের সঙ্গে দেখা করতে চলেছে। তখন যক্ষ মেঘকে কী বলছে তা ঠিক বুঝতে পারাটা নিয়েই বেধেছে গোলমাল। বাবা ঝাঁপিয়ে পড়ে সব পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। শোনো চৌধুরী এবার মেঘের বিদ্যুৎকে তো একটু ঝলসে উঠতে হবে। আর বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলে মনে হবে, মানে সেই বিদ্যুৎকে মনে হবে, কষ্টিপাথরে সোনার রেখাকে যেমন স্নিগ্ধ মনে হয় ঠিক তেমন। নচিবাবুভাবুন একবার, বিদ্যুতের আলোয় অভিসারিকারা তাদের পথ চিনে নিতে পারবে। এত বড়ো সংস্কৃতজ্ঞ বাবা পেয়েছিলাম, কিন্তু নিজের গাফিলতিতে সংস্কৃত আর শেখা হয়ে উঠল না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সেই মেঘদূত আর শকুন্তলার ছত্র সে কদিন আমার মাথায় যেন ছাতা ধরে রেখেছিলেন। এত অস্বস্তি হয়েছিল যে তা বলার নয়। প্রধান বিচারপতির সঙ্গে তাঁর ক্ষমতার প্রদেশে কিছুদিন কাটিয়ে বেশ কয়েকদিনের জন্য তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়। তাঁর চৌধুরীকাকা একটা বিশেষ গাড়িতে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণভারতের দিকে যাত্রা করেন। ফলে আনন্দদা তাঁর ঘরে তাঁর খাটে বসে বছরের পর বছর কাটালেও সুদূর অতীতে একটা সময়ে এসেছিল যখন তাঁর তেমন ইচ্ছে না থাকলেও তিনিহতে পেরেছিলেন যাত্রী। সেই যাত্রার ইতিহাস নচিকেতার কাছে তিনি কখনো কখনো প্রকাশ করেছেন। সেইসব উন্মোচনের পর্বে তাঁর মনোগত ইচ্ছে কখনো কখনো বেরিয়ে এসেছে। ---যাক, চৌধুরীকাকার, কল্যাণে দক্ষিণভারত সারা হলো। একটা কথা মাঝে মাঝে ভাবি, উত্তরভারতটাও যদি এইভাবে হয়ে যায় মন্দ হয় না। ব্যপক অর্থে উত্তরভারত না হলেও তিনি একদল অনুরাগীর ভালোবাসার চাপে পড়ে যেখানে গেছেন সেখানে গঙ্গা উত্তরবাহিনী। আর গঙ্গার কত যে ঘাট। এক-একটা ঘাটের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের অনেক আন্তর উত্থানের কাহিনী। এক -একটা ঘাটে বসে এক

- একজন জ্ঞানবৃদ্ধ এমন বিদ্যুতের সৃষ্টি করেছেন যেগুলি অনধিকারী চোখ ঝলসে দিয়ে গেছে, আর প্রস্ফুটিত করে দিয়ে গেছে অধিকারী চোখ। এমন এক ঘাটে সেই তো অনেক অনেক বছর আগে এক মুমুক্ষু আর এক মুমুক্ষুতে বলতে পেরেছিলিনে বুদ্ধদেবসংক্রান্ত এক আখ্যান। বুদ্ধদেব উপদেশ দিচেছন এক ভিক্ষুকে। সমুদ্রের ছবি এসে গেছে উপদেশের ছবিতে। যে সমুদ্র উত্তাল তাতে ভাসছে একটা কচছপ, আর একটা রন্ধ্রবিশিষ্ট চক্র। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যাচ্ছিল তারা। কচছপের মাথা জলের নীচে। এক শতাব্দীতে সে মাথা ওঠায় একবারই মাত্র। তাও সেটা ক্ষণিকের জন্য। সমুদ্রের অন্ত নেই। সেই অন্তহীনতার মধ্যে ঘুরে বেড়াচেছ কচছপ আর সেই চক্র। প্রশ্ন উঠেছে, যে শত বৎসরে একবার মাত্র ক্ষণিকের জন্য মাথা তোলে তার ক্ষেত্রে সেই সন্নিপাত বা সমাপতনের সময়টা কখন আসবেযখন চক্ররন্ধ্র ভেদ করে উত্থিত হবে কচছপের মুখ? প্রশ্ন তো উঠবেই। কারণ এমন স্তুপ্সন্স্তুনস্তুন্দ্রুস্তুন্দ্ব লক্ষ লক্ষ বছরেও একবার হয় কিনা তা নিয়ে যে সন্দেহ আছে যথেষ্ট। মানুষ হওয়াটাও ঠিক এমনই এখন কঠিন ব্যাপার কিন্তু। সমস্ত বোঝা জলাঞ্জলি দিয়ে গঙ্গার এমন কোনো ঘাটে বসেই কেউ আস্তে আস্তে বুঝতে পেরেছেন, এগিয়ে যেতে গেলে সবার আগে দরকার বিশ্বাস। যে সত্য ইন্দ্রিয়ের উর্ধ্বে ত াকে অনুভব করতে গেলে আগে যাঁরা অনুভব করেছেন তাঁদের কথায় বিশ্বাস রেখে সেইভাবে চলতে হবে প্রথমে। যাঁরা এই বিশ্বাসকে অন্ধ বিশ্বাস বলতে চানতাঁরা কিন্তু ভুল করেন গোড়াতেই। কারণ প্রথমে যেটা বিশ্বাস কেবলমাত্র, পরে সেটাই পরিণত হবে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে।প্রথমে বিশ্বাস, তারপর যুক্তি। এই যে বিশ্বাস তা পরবর্তী স্তরে শোধন করে নিতে হবে যুক্তি দ্বারা। তারপর আসবে যোগাদি প্রক্রিয়া। এগুলির মাধ্যমে শেষে ঘটে সত্যের দর্শন। তখন বিশ্বাস আর যুক্তি অনাবশ্যক হয়ে পড়ে সমপরিমাণে। ভারতবর্ষ বিশ্বাস, যুক্তি ও প্রত্যক্ষ এই তিনটেকে গুত্ব দেওয়ার ফলে তার পরিমণ্ডলে যে বিরাজমান পরমতসহিষ্ণুতা এ কথা এসেছে যাঁর উপলব্ধিতে তাঁর কাছে গঙ্গার ঘাটই বড়ো বড়ো শিক্ষাশালার মর্যাদা পেয়ে এসেছে চিরকাল। আনন্দদা কোন ঘাটে বসে চিঠি লিখেছেন তার উল্লেখ নেই তাঁর পত্রে। কিন্তু তাঁর কৃতজ্ঞতার উল্লেখ আছে ছত্রে ছত্রে। যিনি তাঁকে বছরের পর বছর ঘরে বসিয়ে রেখে এই মুহূর্তে বসিয়ে রেখেছেন ঘাটে, তাঁর কাছে তিনি যে কৃতজ্ঞ তা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি হয়েছেন অকুণ্ঠ। ---নচিবাবু, সাক্ষাতে সব বলিব। এখন শুধু এইমাত্র বলি, গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কে বা চায় এই বাক্যটি সম্যকভাবে বুঝিবার জন্য আমার এই ঘাটে বসিয়া নীরব থাকিবার প্রয়োজন ছিল। বা হিরের আলো জ্বলিতে থাকিলে ভিতরের আলো জ্বলিতে চাহে না। একটা সময় আসিবে যখন এক আলো আর এক অ ালোর পরিপূরক হইয়া উঠিবে। তাহা যতক্ষণ না হইতেছে ততক্ষণ যে বড়োই সমস্যা তাহাও এই ঘাটে বসিয়াই কৃতজ্ঞ চিত্তে অনুভব করিতেছি। আপনি যে দীপদানের মন্ত্র দিয়াছেন তাহার অর্থোদ্ধার করিতে পারে এমন কেহই এখানে আসিব ার পূর্বে আমার নজরে পড়ে নাই। এখানে আসিয়া আশা করিতেছি যে কোনো মুহূর্তে প্রকৃত বঙ্গানুবাদের ব্যাপারটি স ম্পন্ন করাইতে সক্ষম হইব। আমি হাল ছাড়িবার পাত্র নহি।

মে ঘ

যে মেয়েটি ঘর ঝাঁট দেয়, বাসন মাজে এবং চলে যায় খাবার জল এনে দিয়ে শেষে, সে যতক্ষণ কাজ করেচুপ করে কাজ করতে পারে না। নানা সূত্র ধরে সে কথা বলবেই এবং শ্রোতাও করে নেবে নচিকেতাকে। মেয়েটিরওমেয়ে আছে। সেও ম াঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে এসে কাজে হাত লাগায়। দুজনে মিলে কাজ করলে কাজ শেষ হয়ে যাবেতাড়াতাড়ি। ফলে প্রচুর সময় পাওয়া যাবে পাড়ার এ দিকে ও দিকে ঘুরে বেড়ানোর। নচিকেতার বাড়ি ছাড়া আর কোনো বাড়িতে কাজ করে না সে। তার বর রাজমিস্ত্রি। তারা একে অপরকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। তার কাছ থেকে নচিকেতা জানতে বাধ্য হয়েছে, একটা বাড়িতে ভারা বেঁধে একটা ছেলে খুব উঁচুতে কাজ করছিল। আর একটি মেয়ে নীচে মাটিতে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, ছেলেটা মাটিতে নেমে এলে তাকে একটু ভালো করে দেখবে। যে অত উঁচুতে উঠে নির্ভয়ে কাজ করতে পারে তাকে তো দেখতেই হবে চোখ বড় করে। এইভাবে চোখ বড়ো করে দেখতে দেখতেই একদিন চার চোখের মিলন হয়। মেয়েটির মা মেয়েটি যখন ছোটো ছিল তখন তাকে বারান্দায় বসিয়ে এ বাড়িতেকাজ করত। নচিকেতার মা মেয়েটিকে হাতে তুলে দিতেন মোয়া কিংবা নারকেলের নাড়ু। তার মা নচিকেতাকে দাদাবলে ডাকত। সেইসূত্রে মেয়েটি তাকে মামা বলে ডেকে অ াসছে চিরকাল। তার মেয়ে এখনো তাকে সেভাবে কোনো সম্বোধন করতে শু করেনি। যখন করবে তখন নিশ্চয় বলবে দাদু। তাহলে এত দ্রুত দিনকে পদদলিত করে এগিয়ে যাচেছ? বোঝার কোনো উপায়ই থাকছে না? কে বলল উপায় থাকছে না

? অনেক আগেই তার দাড়িতে এসেছে শুভ্রতা। ইদানীং পাক ধরেছে তার বেশ কিছু কেশে। আর দাঁত তো নির্দয়ভাবে সরে পড়তে শু করেছে তা প্রায় এক দশক হলো। তবে একটা কথা ঠিক। তাকে যে কেউ যখনতখন দাদু বলে ডেকে উঠলেও সে কিন্তু দাদুর দস্তানা পরে ঘুরবে না পৃথিবীতে। যতদিন থাকবে বেপাড়ার এক পাগলের একটা কথা মনে রাখবে রোজ। বেপাড়ার পাগল নচিকেতার ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে তাদের পাড়ায় তাদের খেলার মাঝখানে এসে পড়ত ধপ করে। যে খেলতে গিয়েপড়ে গেছে, ধুলো ঝেড়ে উঠতে গিয়ে সময় নিচ্ছে, তার সামনে ঝুঁকে পড়ে তাদার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে উঠত-- হিম্মত রাখিস।

---কী গো মামা, কী এত ভাবছ বলো তো? আমি এত কথা বলছি তুমি কোনো জবাব দিচ্ছ না। আমি কি একাই বকবক করে যাব? নচিকেতা তার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকায়। নতুন করে তার শ্রোতা হওয়ায় ইচ্ছে প্রকাশ করে। সে পুরোনো শ্রোতাকে নতুনভাবে পেয়ে নতুন খবর পৌঁছে দিতে চায়। ---জানো মামা, গুজরাটি মেয়েগুলো না খুব সেজেছে। সেজেগুজে তৈরি হচ্ছে। একটু বাদেই তো ওদের নাচ শু হয়ে যাবে। আজ কী বলো তো? নচিকেতার মা যার কচি হাতে মুড়ির মোয়া বা নারকেলের নাড়ু তুলে দিতেন সে খুব সরলভাবে খুব আগ্রহের সঙ্গে যে উত্তর দিতে পারবে বলে তার অ াশা তার দিকে কাজ বন্ধ করে তাকিয়ে আছে। তার হাত ডুবে আছে অমার্জিত আধারের মধ্যে। তার চোখ কিন্তু ভাসছে। --তুমি কী গো মামা ? এত কিছু বলে দেওয়ার পরেও জবাব দিতে পারছ না? আজ কী? গুজরাটি মেয়েরা বছরে একবারই তো দল বেঁধে সেজেগুজে নাচতে শু করে। মনে পড়ছে? নচিকেতারহঠাৎ মনে পড়ে যায় আজ আনন্দদা ফিরে আসছেন। ক ারণ তাঁর পত্রে পরিষ্কার উল্লেখ ছিল জন্মাষ্টমীর। ---খুব ভালো কথা মনে করিয়েছিস। আজ জন্মাষ্টমী। আনন্দদা ফিরবেন আজ।

আজ সারাদিন ধরে গুজরাতি মেয়েরা নাচছে। মাইকে গান হচ্ছে। সেই গানের তালে তালে নাচছে তারা। তাদের প্রত্যেকের হাতে কাঠি। নাচের তালে তালে কাঠির সঙ্গে মিলিত হচ্ছে কাঠি। ঘরে বসেও সেই মিলনের শব্দ শুনতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না নচিকেতার। একটা কথা তার মনে হচ্ছে বারংবার বহুবছর ধরে তাদের পাড়ার বস্তি থেকে মেয়েরা এই বিশেষ দিনে বেরিয়ে এসে যে নাচ চালিয়ে যায় একটা মণ্ডপের মধ্যে তাতে যোগ দিতে এগিয়েআসে ছেলেরাও। তার ফলে নাচের নিজস্ব সমন্বয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিভাত হতে থাকে আরো একটা সমন্বয় নিঃসন্দেহে। সব মিলিয়ে যেটা ঘরে বসেও ধরা পড়ে এসেছে এতদিন সে প্রাণোজ্জ্বলতার ক্ষেত্রটি এবার যেন ছোটো হয়ে এসেছে বেশ খানিকটা। তার ভয় হয়, কাছের অতীতে বিপুল ভূমিকম্প হয়ে গেছে সেই প্রদেশে যেখান থেকে এসে যারা নাচে তারা চিরকাল ঘর বেঁধেছে ত াদের পাড়ায়। ক্ষয়ক্ষতির ছবি দেখে, খবর শুনে সে অন্তত এইটুকু বুঝতে পেরেছে, ধবংস তার সাম্রাজ্য বিস্তার করতে অ াপাতত বেছে নিয়েছে সেই প্রদেশ। যারা দেশে গিয়েছিল তাদেরসবাই যে ফিরেছে এ কথা বলার উপায় নেই। যারা দেশে যায়নি তাদের কারো কারো দেশে কেবল স্মৃতি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না। জন্মাষ্টমীর নাচে তো ত ার সুদূর একটা প্রভাব পড়তেই পারে আজ। সে সূর্য অস্ত যাওয়ার ঘন্টা দুয়ের বাদে আনন্দদার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে টের পেল, গানের তালে নাচ চললেও সত্যিই ছোটো হয়ে এসেছে সেই ক্ষেত্রটা। এ বছর তা পরিষ্কার অনেক।

দূর থেকেই বুঝতে পারল আনন্দদা ফেরেনি। ফিরলে তাঁর ঘরে আলো জ্বলত। যদি এমন হয়ে থাকে যে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছেন তবে তো ঘরের কাছাকাছি গিয়ে সব দেখে আসা দরকার। সে ঘরের দিকে যত এগোয়তত সারমেয় জাগ্রত হয়। কেউ কেউ তার কাছে এগিয়ে আসে। তারা যে বেশ কয়েকটা দিন তাকে দেখতে পায়নি এমন এক মনোভাব তাদেরি অবস্থানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। সে দরজার একেবারে কাছে গিয়ে ঝুলন্ত তালা স্পর্শকরে দেখে একবার। একটু দাঁ ড়িয়ে থেকে সে বাইরে বেরিয়ে এসে কাছের দোকান থেকে এক ঠোঙা বিস্কুট কেনে।ফিরে গিয়ে যারা আনন্দদার দরজা প াহারা দিচ্ছে তাদের মধ্যে বিলিয়ে দেয় সেই বিস্কুট। তারা প্রাণোজ্জ্বলতা দিয়ে তার এই দান গ্রহণ করে। দ্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় সে ব্যাপারে তার কোনো শিক্ষানেই। যারা বাড়ির পেছনে থাকে রাত্তিরে তারা কেউ সামনে আসছে না। সামনে আসছে কেবল অন্ধকার আর নীরবতা। অপেক্ষা করতে করতে সে সিদ্ধান্ত নিল ভেতরে যাওয় ার। ভেতরে মানে যেখানে সুশীল থাকে, সুনীল ও তার সংসার বিরাজ করে পূর্ণমাত্রায়।

ভেতরে ঢুকে সেই শতাব্দীপ্রাচীন উঠোনের মাথার ওপর এককালে হনুমানের আক্রমণ থেকে সংসার বাঁচানোর জন্য যে জ াল দেওয়া হয়েছিল তার নীচে দাঁড়াতে হয় নচিকেতাকে। সারা উঠোনে একটা আলোরই সীমাবদ্ধ কিরণ এসে পড়েছে।

সুশীলের ঘরের সামনেটা খুবই অস্পষ্ট। উঠোনের দিকে মুখ করে থাকা কয়েকটি ঘরের অধিবাসীরা আজ স্মৃতি হয়ে গেছেন বলে বড়ো বলো তালা ঝুলছে প্রতিটি ঘরে। সে প্রথমে সুশীলের নাম ধরে ডাকে। কোনো সাড়া পায় না। সুনীলের ঘর তার দৃষ্টিপথে নেই। একটু আড়ালে সেটা। তবু সে সুনীলের নাম ধরে ডাকে তারকণ্ঠস্বর পৌঁছে দেয় সেই অদেখা অঞ্চলে। কিন্তু কেউ সাড়া দেয়ে না। সে তখন ইভার নাম ধরে ডাকে। তাতেও কোনো কাজ হয় না আদৌ। সে একবার ভ াবে উঠোনে দাঁড়িয়ে না থেকে এগিয়ে যাবে আরো। কিন্তু তার সাহসের অভাবহয়। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে দাঁ ড়িয়েই শেষ চেষ্টা করে। সে তার নাম ধরে ডেকে ওঠে যাকে সে বহুবছর আগে সকালে আনন্দদার খাটে বসে দেখেছে দুহ াত ব্যবহার করে সংসারের জল বহন করে নিয়ে যেতে। সেই নিস্তব্ধ যামিনীতে তার নাম ধরে ডাকায় কাজ হয় সত্যিই। অঁ াচলের শৈথিল্য নিয়ে আলোর আঁচের মধ্যে এসে দাঁড়ায় নু। তার চোখে কেমন এক কেন্দ্রবিন্দু। সেইদিকে তাকিয়ে সরব হয়ে নচিকেতা। ---আনন্দদার খোঁজে এসেছিলামদিরজায় তালা ঝুলছে। তিনি ফেরেননি? ---ফোন এসেছিল ইভার বাব ার কাছে বিরাট গণ্ডগোল হয়েছে। সমস্ত ট্রেনলেট। কে কখন ফিরবে কোনো ঠিক নেই। ---একেবারে একা ? আর কাউকে দেখছি না। সব কোথায়? একাকিত্বেরএই প্রশ্ন হেসে ওঠে নু। সে হাসি ঠিক পরধর্মের হাসি নয়। ---আপনাকে একটা প্রণাম করি নচিদা। আপনি ঠিক ধরেছেন, সব গেল কোথায়? আমি কিন্তু কোথাও যাইনি। এই দেখুন আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কোনো বাধা তাকে আটকাতে পারে না। সে নিচু হয়ে প্রণাম করে তার সামনের মানুষটিকে। ---এখানে ভীষণ গরম। চলুন একটু বাইরে গিয়ে বসি। তারা দুজনে শেষে সেখানে গিয়ে বসে যেখান থেকে চিরকাল সামনের প্রসারিত কৌটোয় কেউ না কেউ একসময় ফেলে এসেছে ভারতীয় মুদ্রা। ---নচিদা, ভালো আছেন তো? আমাকে এই প্রশ্ন কেউ কখনো করে না। তাই আমি আপনাকে এই প্রশ্নটাই করছি। নুর চোখের দিকে তাকাতে চায়, কিন্তু পারে না নচিকেতা। রাত আপনমনে বাড়ে। আর তারা বসে থাকে আপনমনে পথের দিকে তাকিয়ে।

হঠাৎ চারিদিক হরিধবনিতে ভরে যায়। একটা শবকে ঘিরে কিছু মানুষ এগিয়ে আসছে। নুর মধ্যে কেমন এক চঞ্চলতা জ াগে। সে নচিকেতার হাত ধরে টানে এবং উঠে দাঁড়ায়। ---চলুন নচিদা, ওদের খানিকটা এগিয়ে দিই। পুষ নারীর এই অ ামূল আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারে না। তারা এগিয়ে এসে সেই শবযাত্রায় যোগ দেয়। নচিকেতা বুঝতে পারে, যাকে পা র্থিব বলা হয়েছে এবং যাকে বলা হয়েছে অপার্থিব দুইই ক্রিয়াশীল আজ। লাজবর্ষণ হচ্ছে ডাইনে বাঁয়ে সামনে। সে যত হঁ াটে অনুভূত হয় তাদের সঙ্গে আজ চলেছেন সংস্কৃতের শিক্ষকেরা. আছেন অনাথবন্ধুও। আরে ওই তো শম্ভুনাথ। ওই তো সুধীর আর সীমা। আর্যপুত্র এবং আর্যকন্যাও পিছিয়ে নেই। আর সবাইকেছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে সেই এক্সাজও যা তারই হাতে ছাদে অর্পিত হয়েছিল একদিন।

হাঁটতে হাঁটতে যত এগিয়ে যাওয়া যায় ততই আকাশটা ভেতরে চলে আসতে থাকে ক্রমাগত। আর এই নতুন আকাশের জন্য দীপদানের নতুন মন্ত্র নামতে থাকে নতুন মেঘের কোল থেকে একটু একটু করে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com